বাঙলাকথা

বর্ষপূর্তি ও ঈদ সংখ্যা ২০১৮

উপন্যাস

গল্প ॥ কবিতা ॥ ভ্রমন

প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ

এক মলটে অনেক কিছু

Cute
ভেসজ নির্যাসে
মজবুত ও উজ্জ্বল দাঁতের ভিত্তি
পুদিনা ও লবঙ্গ এর এন্টিসেপটিক প্রপার্টি মাড়ি ব্যাথা ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
দেয় উজ্জ্বল সাদা দাঁত এবং সজীব প্রানবন্ত নিঃশ্বাস।
Herbal Active
পুদিনা
Cute
PUDINA
LABANGO
TOOTH PASTE

বাঙলাকথা
Banglakotha

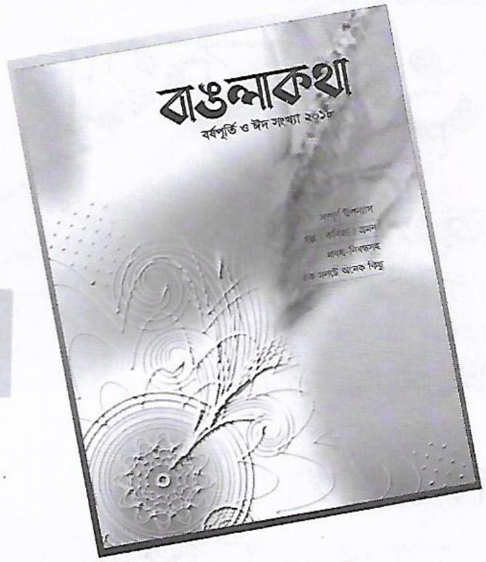

সূচিপত্র

প্রধান রচনা:

মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জীবন ও সৃষ্টি — ০৪
মো. শরীফ হোসেন

গল্প

দুলালীর দিনকাল — ০৬
শফীউদ্দীন সরদার

বন্যা — ১৪
অভ্র ওয়াসিম

উপন্যাস

রাত পোহাবার কত দেরি — ১১
মুহাম্মদ ফজলুল হক

ভ্রমণ

কক্সবাজার ভ্রমণ গাইডলাইন — ২৫
মেহেদী হাসান শাকিল

আইন

নারী ও শিশু নির্যাতন ও তার প্রতিকার — ২৭
মো: আবু তোরাব

ধর্ম

ঈদুল ফিতর : উদযাপন পদ্ধতি — ২৯
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

কুরআন নাযিল ও কুরআন বিজয়েরও মাস মাহে রমযান — ৩২
মোঃ মিজানুর রহমান

নিবন্ধ

প্রতিবেশীর অধিকার Neighborhood rights — ৩৪
এসএমডি বায়জীদ হেলাল

কবিতা

পাপ — ৩৫
আবু সাকী মাহবুব

বরফ-কষ্ট — ৩৫
সমর ইসলাম

নিস্তেজ আর্তনাদ — ৩৫
আমিনুল ইসলাম তন্ময়

পথের শেষ নেই তবু পথে — ৩৫
মোঃ মোসলেম উদ্দিন সাগর

ফররুখ আহমদ এর জন্মশতবর্ষে
মেঘনা
ম্যানিলা
ককটেল পার্টি — ৩৬
মোঃ জেহাদ উদ্দিন

মা, আমার মা — ৩৭
অভ্র ওয়াসিম

পবিত্র রমজান
রমজানুল কারীম
নাঈম দূর্জয় — ৩৭

কাব্য-গাঁথা

ফিলিস্তিনের বন্দি — ৩৮
মোহাম্মদ এনাম সিকদার

কিচির-মিচির

মহাসাগরের এক বিন্দু কণা নয় — ৪০

বাঙলাকথা

এজেন্ট নিয়োগ চলছে

দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাসিক বাঙলাকথার এজেন্ট নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন।

সার্বিক যোগাযোগ

বাঙলাকথা

স্যুট # ১০০৮/এ, নাহার প্লাজা
হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৬৭৮০৬০৪৯৫, ০১৭৮৫৯৩৭২৭৩
ই-মেইল: banglakotha2011@gmail.com

নিয়মাবলী

- মাসের যে কোনো সময় এজেন্ট হওয়া যায়
- ১০ (দশ) কপির কম এজেন্ট করা হয় না
- এজেন্টদেরকে ৩৩% কমিশন দেয়া হয়
- ভিপিপি অথবা কুরিয়ার যোগে পত্রিকা সরবরাহ করা হয়

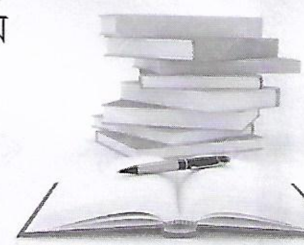

www.banglakothabd.com

নিজে পড়ুন

অপরকে পড়তে বলুন

বিজ্ঞাপন দিন

প্রতি বছর সডাক মাত্র ৭০০ টাকা (ঈদ সংখ্যাসহ) জমা দিয়ে বাঙলাকথার গ্রাহক হোন। পত্রিকা পেতে হলে কূপনটি পূরণ করে ডিডি/টিটি/পে-অর্ডার জমাদানের রশিদসহ নিম্ন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

স্যুট # ১০০৮/এ, নাহার প্লাজা
হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৬৭৮০৬০৪৯৫, ০১৭৮৫৯৩৭২৭৩
ই-মেইল: banglakotha2011@gmail.com

বাঙলাকথা

বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে গ্রাহক কূপণ

গ্রাহকের নাম :..

ঠিকানা :..

....

টাকা জমাদানের রশিদ নং

তারিখ :........................ ব্যাংক: ....

ফোন/মোবাইল: ই-মেইল (যদি থাকে):

টিটি/ডিডি/পে-অর্ডার/বিকাশ অনলাইনে টাকা জমা দিতে হবে।

বিকাশ নম্বর: ০১৬৭৮০৬০৪৯৫

ইমরান হোসেন

স্যুট # ১০০৮/এ, নাহার প্লাজা, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫

ই-মেইল: banglakotha2011@gmail.com

বাঙলাকথা
Banglakotha

রেজি নং- ডিএ ঢাকা-৬১০২
অষ্টম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০১৮ ইং
চৈত্র-ভাদ্র ১৪২৪ বাংলা
রজব-জিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরী

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
মো. শরীফ হোসেন

সম্পাদক
রাবেয়া সুলতানা পারু

নির্বাহী সম্পাদক
সমর ইসলাম

বার্তা সম্পাদক
কামরুল ইসলাম

আইন বিষয়ক সম্পাদক
মো: আবু তোরাব

মফস্বল সম্পাদক
মো. আবু তাহের

শিক্ষা সম্পাদক
মো. হুমায়ুন কবীর

সাহিত্য সম্পাদক
ফয়সাল আজিজ

ক্যাম্পাস সম্পাদক
নাঈমুল ইসলাম

চিকিৎসা সম্পাদক
সাবরিনা শাওন

প্রতিবেদক
আবুল বাশার

কিচিরমিচির
রাজিন শারাফি, জায়েদ আসযাদ

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
ইমরান হোসেন সুজন: ০১৬৭৮০৬০৪৯৫
দাম: ৫০.০০ টাকা মাত্র

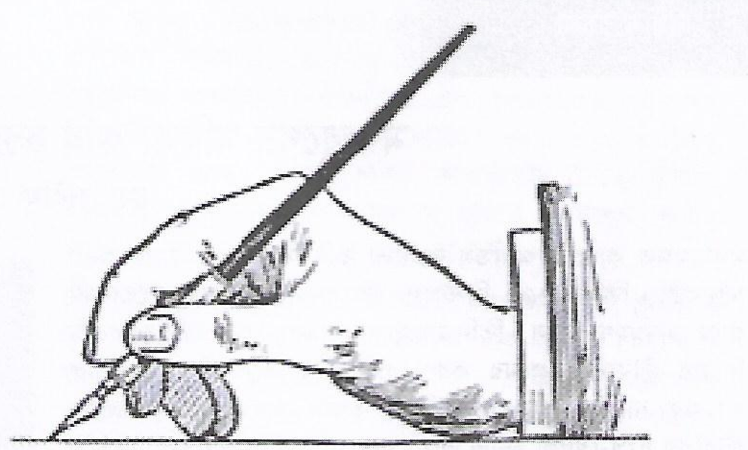

স ম্পা দ কী য় ::

নানান চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে মাসিক বাঙলাকথা। আনন্দঘন এই মুহূর্তে বাঙলাকথার লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতাসহ সকল শুভানুধ্যায়ীকে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা জানাই। সেই সাথে সকলকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা।

যে স্বপ্ন নিয়ে বাঙলাকথা তার যাত্রা শুরু করেছিল তার বেশিরভাগই যে পূরণ করা সম্ভব হয়নি এ কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। আমাদের ব্যর্থতার পেছনে যে যৌক্তিক অনেক কারণ রয়েছে তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করার মতো হৃদয়বান লোকের অভাব হয় তো এখনও আমাদের সমাজে নেই। তবুও আমরা জোর দিয়ে কেবল এটুকু বলতে পারি, কেবল পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়টুকু মেটানোর আর্থিক সামর্থ্য থাকলে বাঙলাকথা এতদিনে হয়তো সমাজবদলের একটি কার্যকরী গণমাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হতে পারত। তবে আমরা হতাশ নই। আট বছর মাঠে টিকে থাকাও তো একটি বড় অর্জন। আর এই অর্জনের সকল কৃতিত্ব বাঙলাকথার শুভানুধ্যায়ীদের।

ফেইসবুক, ইউটিউব, ভাইবার, মেসেঞ্জার, হোয়াটসআপ, টুইটারসহ তথ্য-প্রযুক্তির এই সয়লাবের জমানায় বাঙলাকথার মতো একটি মাসিক পত্রিকা টিকে থাকা অতি আশ্চর্যজনক বৈ কি। অনেকেরই প্রশ্ন, পরিবর্তিত পৃথিবীতে মুদ্রিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা টিকবে কি না। আমরা বলি, অবশ্যই টিকবে। কেননা, মুদ্রিত বিষয়ের আবেদন চিরন্তন।

বাঙলাকথাকে আমরা নতুনভাবে সাজানোর কাজে হাত দিয়েছি। অতীতে যেভাবে বাঙলাকথাকে আপনারা সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন সেইভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও করবেন- এ প্রত্যাশা আমাদের।

সম্পাদক কর্তৃক আনীশা প্রিন্টার্স, ৮/এ, কাঁটাবন রোড, নীলক্ষেত, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ২২৬ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
সার্বিক যোগাযোগ: স্যুট # ১০০৮/এ, নাহার প্লাজা হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল: ০১৬৭৮০৬০৪৯৫, ০১৭৮৫৯৩৭২৭৩
ওয়েবসাইট: www.banglakothabd.com
ই-মেইল: banglakotha2011@gmail.com

মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জীবন ও সৃষ্টি

মো. শরীফ হোসেন

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী। তিনি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলার পাতোয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধ্যযুগের মহিলা কবি। কবি চন্দ্রাবতী নিজের জীবনের প্রেমের করুণ পরিণতির জন্যে নিজেই লোক কাব্যের নায়িকা হিসেবে সাহিত্য ভুবনে অমর হয়ে আছেন। জীবনের দুঃখ-বেদনা ভুলার জন্যে ফুলেশ্বরী নদীর তীরে শিবমন্দিরে উপাসনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী রামায়ণ অনুবাদে নিয়োজিত হন। কিন্তু তা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়।

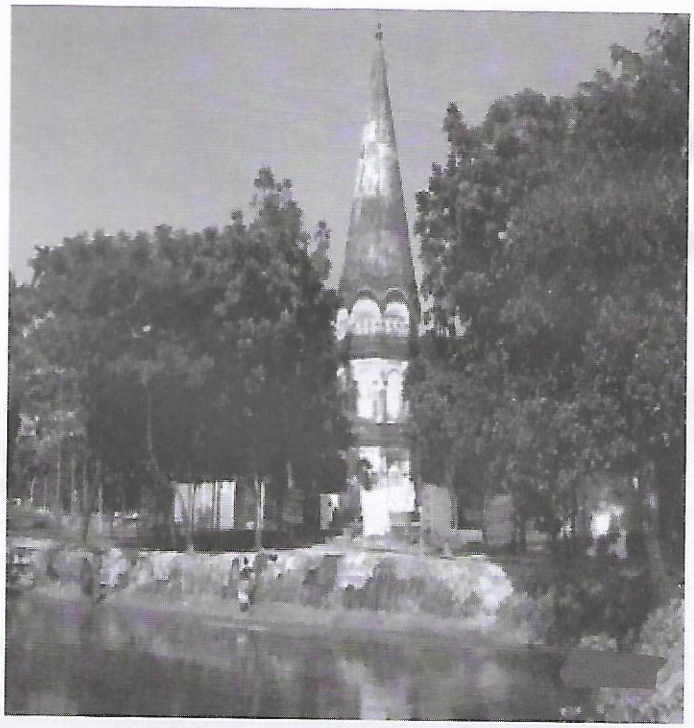

ফুলেশ্বরী নদীর তীরে শিবমন্দির

আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষে চন্দ্রাবতী রামায়ণের অনুবাদ করেন। গ্রাম্য রামকথার উপর নির্ভর করে তিনি মেয়েলী রীতিতে পালা রচনা করেছিলেন বলে তাতে অনুবাদ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে লোকসাহিত্যের লক্ষণই বেশি ফুটে উঠেছে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৩২ সনে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ প্রকাশ করেন। লৌকিক ও মানবিক উপাদান যোগে কাব্যটি রচিত হয়েছে বিধায় এটি মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার গাঁথা মলুয়া, দস্যুকেনারামের পালা, দেওয়ান ভাবনা ইত্যাদি তার প্রণীত। এসব গাঁথায় চন্দ্রাবতীর অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় মেলে। তার ভাষা মার্জিত, সহজ-সরল কিন্তু কবিত্বে ভরপুর। এসব গাঁথায় তিনি যে দৃশ্য এঁকেছেন তা তুচ্ছ করার কিছু নেই। বিশেষ করে 'মলুয়া'য় মলুয়ার যে প্রেম-শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন তা অসাধারণ এবং কালোত্তীর্ণ। ভারতীয় নারীর এ আদর্শ কেবল সীতা সাবিত্রির সাথেই তুলনীয় হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'তাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই; দুশ্চর তপস্যা আছে কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই। এক কথায় সেখানে পার্থিব প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই। পল্লীগীতিকার প্রেম বিরাট আকাশের নিচে, নীলবনান্ত প্রদেশে, রক্তপুষ্পরঞ্জিত বন্যবীথিতে কংস, ধনু প্রভৃতি নদ সৈকতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছে কিন্তু তাহা মন্দির জুড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নরনারীর প্রেম। ইহা উপাস্য উপাসকের সাধনা নহে। তথাপি এই প্রেম স্বর্গের অতি সন্নিহিত।'

মলুয়া একটি ধারাবাহিক কাহিনী মাত্র কিন্তু কবির কাব্যিক শক্তি যে অসামান্য তা এ কাহিনী বর্ণনে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামের পথের দু'ধারে ফুল যেভাবে বিকশিত হয়, গন্ধ ছড়ায় তেমনি চন্দ্রাবতীর কাব্য অপার্থিব সুধা দান করে। যেমন-

"কার্ত্তিক মাসেতে বিনোদ বিদেশ কামাইয়া।
ঘরেতে আইল বিনোদ মায়েরে ডাকিয়া।।
দিন নাই রাইত নাই মায়ের আঁখি ঝুড়ে।
মা বলিয়া কে ডাকল আইজ দুঃখিনী মায়েরে।।
কামাইর টাকা দিয়া বিনোদ নজর আদি দিল।
বাজেপ্ত আছিল জমী খালাস হইল।।
আটচালা বান্দিল বিনোদ যতন করিয়া।
হরষিতে শুইল বিনোদ মলুয়ারে লইয়া।।
বিরহ-বিচ্ছেদের কথা দুঃখের কাহিনী।
একে একে বিনোদেরে শুনাই কামিনী।।
মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল।।
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক।।
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হরানো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন।।"

মলুয়ার কাহিনী পাঠ করে পাঠক হৃদয় বার বার কম্পিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি মলুয়ার জীবনকে শুধুই অযোধ্যার রাজবধূ সীতার জীবনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে ভারতীয় নারীর যে মহান আদর্শ স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা তা এ বিশ্বে বিরল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার জোরে এ মহাচিত্র দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্ছে।

নারী তার মানসিক শক্তি বলে স্বামীকে উদ্ধার করতে পারে, রক্ষা

করতে পারে কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীকে সন্দেহের উর্ধ্বে নিতে পারে না- এটাই আমাদের সমাজের নিয়ম। এ নিয়ম আগেও ছিল এখনও আছে।

সমাজের এ নিয়মে সতী সীতা লাঞ্ছিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে; পরিশেষে অত্মাহুতি দিয়েছে। মলুয়ারও

একই পরিণতি। নারীর এ পরিণতি আমাদের সমাজের নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের সমাজ সতীকে করুণা করে, উদ্ধার করে না।

যে সর্বস্বত্যাগী ভালবাসা দিয়ে মলুয়া স্বামীকে ভালবেসেছে তা সামাজিক নিয়ম বা ধর্মীয় বিধানে সৃষ্টি হয়নি। এতে কোনই কৃত্রিমতা নেই; ইহা একান্তই হৃদয় থেকে জন্মানো। যেখানে মানুষ আছে মানুষের হৃদয় আছে সেখানে এই প্রেমসুধার প্রয়োজনও থাকবে।

মলুয়ার হৃদয়ের শক্তি, প্রেমের শক্তি অতুলনীয়। এ অতুলনীয় প্রেম শক্তির দ্বারাই সে তার নারী-ধর্ম সতীধর্ম রক্ষা করেছে। এ সতিত্ব সমাজের গতানুগতিক বিধি-নিরপেক্ষ। দেওয়ানের হাওলীতে থেকেও মলুয়া তার সতিত্ব রক্ষা করেছে শুধুই প্রেমের শক্তিতে। সুতরাং নারীর সতিত্ব সম্পর্কে আমাদের সমাজের চিরাচরিত যে ধারণা প্রচলিত, এ গীতিকা পাঠ করলে সে ধারণায় আঘাত লাগে।

সতিত্ববোধ নারীর একটা নিজস্ব ও ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ। সমাজ বাহির থেকে এর নিয়ম সৃষ্টি করে সতিত্বের সীমারেখা নির্ধারণ করলে তা ফলপ্রসূ হবে না।

চন্দ্রাবতীর আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি 'দেওয়ান ভাবনা '। দেওয়ান ভাবনার নায়িকা সুনাই, নায়ক মাধব। সুনাইয়ের সাথে মাধবের দেখা হয় নদীর ঘাটে। অতঃপর দু'জনের ভাল লাগা এবং ভালবাসা। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই দেওয়ান ভাবনা সুনাইকে অপহরণ করে নদী পথে নিয়ে যাবার সময় মাধব সুনাইকে উদ্ধার করে এবং যথাবিধি তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু সুনাই ও মাধব স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনি। সুকৌশলে দেওয়ান মাধবের পিতাকে নিয়ে যায়। মাধব পিতাকে উদ্ধার করতে গেলে দেওয়ান তার পিতাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে বন্দি করে। সুনাই স্বামীকে উদ্ধার করতে দেওয়ান ভাবনার হাতে ধরা দেয়। সুনাইকে পেয়ে দেওয়ান মাধবকে ছেড়ে দেয়; কিন্তু দেওয়ান তার হীনবাসনা চরিতার্থ করার পূর্বেই সুনাই সতিত্ব রক্ষার জন্যে আত্মহত্যা করে। কাব্য দুটির বিষয়বস্তুতে সামান্য পার্থক্য থাকলেও এদের ভাব, ভাষা, কাব্য-সৌন্দর্য, কবিত্ব, নায়িকার আত্মত্যাগ, নিস্প্রভ নায়ক চরিত্র প্রভৃতি প্রায় একই রকম।

কোন বিশেষ দার্শনিক বিশ্বাস কিংবা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এ গীতিকাগুলোর রচয়িতার জীবনদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। নারী-জীবনের দুঃখ-বেদনা, আত্মত্যাগ, স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা ইত্যাদি অতি সহজভাবে কবি তুলে ধরেছেন। গীতিকা দুটির সর্বত্রই মুক্ত প্রেমের জয়গান। নারী স্বাধীনভাবে জীবন সাথী নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। হৃদয়কে গুরুত্ব দিয়ে বাকি সবকিছুকে অস্বীকার করার শক্তি সঞ্চয়ে গীতিকার প্রেম সার্থক। গীতিকাগুলোর প্রেমের মুক্তগতি, দেহসৌন্দর্যের প্রজ্জ্বলিত মাদকতা, কামনার অহঙ্কৃত তীব্রতা, আত্মদানের তেজোগর্ভ স্বাভাবিকতা পাঠকদের এক কল্পলোকের সৌন্দর্যের মধ্যে নিয়ে যায়। গীতিকাগুলো নায়িকা প্রধান এবং এগুলোর কেন্দ্র-কথা প্রেম। প্রেমের শক্তিই কাব্যগুলোর বৈচিত্র্য। তবে চন্দ্রাবতী এ গীতিকাগুলোর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নারীর প্রেমে যে নিষ্ঠা আছে পুরুষের প্রেমে তা নেই।

চন্দ্রাবতী তার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মলুয়াকে, সুনাইকে সৃষ্টি করেছেন; তাই তার এ সৃষ্টি শাশ্বত এবং চিরন্তন। চন্দ্রাবতী ভালবেসে প্রতারিত হয়েছেন কিন্তু কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। অগুনে পুড়ে তিনি কাঠি সোনার অলংকারে পরিণত হয়েছেন, হতাশায় হারিয়ে যাননি।

একই গ্রামের জয়চন্দ্র নামের এক ব্রাহ্মণ যুবক ছিল তার সহপাঠী। শৈশব থেকেই একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হয়। পরিণত বয়সে বিবাহেরও প্রস্তাব উঠে কিন্তু জয়চন্দ্র এক মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়ে গেলে বিবাহ ভেঙ্গে যায়। কিছু দিন পর অনুতপ্ত হয়ে জয়চন্দ্র ফিরে আসে চন্দ্রাবতীর কাছে। চন্দ্রাবতী তাকে আর গ্রহণ করেনি। ফলে সে আত্মহত্যা করে। এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ-গীতিকার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, 'এক তীর্থ পাতুয়ারী গ্রাম, এখানে দ্বিজ-বংশীদাস ও তার গুণবতী কন্যা চন্দ্রাবতী একত্রে 'মনসার ভাসান' রচনা করেছিলেন। চন্দ্রাবতী তপস্বিনী, সহসা চন্দ্রিকাভূষিত শারদাকাশের গায় যেরূপ বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, এই পরম নিষ্ঠাবতী যোগশান্ত পূজারিণীর শুদ্ধ চিত্তে সেইরূপ একবার সাংসারিক প্রেমের একটা আকস্মিক লহরী খেলিয়া গিয়াছিল। নিরাশ জীবনকে শিবের পায়ে উৎসর্গ করিয়া চন্দ্রাবতী যে মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার গাত্রে রক্তমালতীফুলের রস দিয়া উন্মত্তবৎ জয়চন্দ্র তাহার শেষ নিবেদন অনলবর্ষী অনুতাপের ভাষায় লিখিয়া ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন– সেই জরাজীর্ণ মন্দিরের অবশেষ ফুল্লেশ্বরী নদীর তীরে এখনও বিদ্যমান।"

চন্দ্রাবতী আর বিয়ে করেননি। ফুলেশ্বরী নদীর তীরে পিতার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরে আরাধনা করে, সাহিত্য চর্চা করে কাটিয়েছেন তার জীবন। তার সারা জীবনের শ্রম-ঘাম দিয়ে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন রামায়ণ, দেওয়ান ভাবনা, মলুয়া ও দস্যু কেনারামের মত আরও অনেক অনবদ্য সৃষ্টি।

মধ্যযুগের এ শক্তিমান মহিলা কবি শুধুই কিশোরগঞ্জের নয়, সমস্ত বাঙালি নারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আশরাফ সিদ্দিকী : লোক-সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)
৩. দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
৪: সৈয়দ আজিজুল হক : মৈমনসিংহ গীতিকা (সম্পাদিত)
৫. মাহাবুবুল আলম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

দুলালীর দিনকাল

শফীউদ্দীন সরদার

: সে কি লো? সে কি লো ধোলীর মা? তোমার বাড়িতে আবার ঘটকের আনাগোনা দেখতাছি যে? আবার কোন বদ খেয়াল মনে জাগলো তোমার?

ধোলীর ওরফে দুলালীর মা বুঝতে না পেরে বলে– বদখেয়াল।

প্রশ্নকারিণী ধোলীর মায়ের প্রতিবেশী মতির মা। মতির মা বলে– নয়তো কি? এর পরেও লাজ হয়নি তোমার?

: লাজ! আমার লাজ হওয়ার কি দেখলে, কও দেখি?

: আবার ক্যান তোমার বাড়িতে ঘটক আনাগোনা করতাছে? ঐ বেঈমান পরদেশীটার হাতে এতবড় দাগা খাওয়ার পরও ফের খোয়াব দেখতাছো নিকাহ বিয়ার?

ধোলীর মা শরম পেয়ে বলে– ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কি যে কও বুবু? ঝাঁটা মারি ঐ নিকাহ বিয়ার মুখে। একবারেই ঢের লাজ হয়াছে আমার। ফের ঐ গর্তে পা দিমু আমি?

: তাইলে আবার ঘন ঘন ঘটক আসতাছে ক্যান?

: সেটা কি আমার জন্যে? ঘটক আসতাছে আমার ধোলীর জন্যে।

: ধোলীর জন্যে! ও মাগো মা, ইডা আবার কুন কথা কও? এখনই ধোলীর শাদি দিবা নাকি তুমি?

নিঃশ্বাস ফেলে ধোলীর মা বলে– হ্যাঁ। না দিয়া আর কি করমু।

: কি করমু মানে? ঐ টুকুন বাচ্চা মেয়ের শাদি দিবা? ওর গায়ে তো আতুর ঘরের গন্ধ লাইগাই আছে এখনও।

: তয় কি করমু? বিছানায় শোয়ায়ে রাইখা ঘুম পারামু?

মতির মা গলায় জোর দিয়ে বলে– ঘুম পারাইবা ক্যান? পাঠশালায় পাঠাইবা। গাঁয়ের কত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বাইন্ধা পাঠশালায় যায়। ওদের সাথে ধোলীও যাবে।

পাঠশালায় যাইয়া ও কিছুটা লেখাপড়াও শিখুক আর ততদিনে কিছুটা বড়সড়ও হউক।

: খাওয়ামু কি? ততদিন ওরে খাওয়ামু কি? ছাওয়াল তো ঐ একটাই লয়। উডা বাদে আরও দুই দুইডা ছোট ছোট ছাওয়াল-পোয়াল আছে। দুই বেলা কাউকেই পেটপুরে খাওয়ার দিবার পারিনে। সবগুলোকে ঘরে বাইন্ধা রাইখা খাওয়ামু কি?

: ধোলীর মা!

: ধোলীরে শাদি দিলে পরের বাড়িতে গিয়ে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারবে। এভাবে শুকাইয়া মরতে হবে না।

এরপরে আর কথা খুঁজে পায় না মতির মা। ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রশ্ন করে– তা তোমার ঐ সব্বনেশে মিনষের, মানে ঐ বিবেকহীন কাফেরটার আর কোন খবরই কি পাওনি?

: পাই নি আবার। নিজের দ্যাশে ফিরে গিয়ে সে নাকি আবার শাদি কইরাছে নতুন কইরা।

দুই তিনডে ছেলে মেয়েও হয়্যাছে নাকি সেখানেও। নতুন বউ বাচ্চা লিয়া নাকি সুখেই আছে সে। এদিকে আমরা বেঁচে রইলাম না ভেসে গেলাম তা লিয়া কি কিছু মাত্তর চিন্তা আছে ঐ বিবেকহীন লোকটার?

এরপর নীরব হয়ে ফিরে যায় মতির মা। যেতে যেতে সে বড় করেই মলিনকণ্ঠে বলে– কপাল কপাল! পাঠশালায় যাওয়ার বয়সে সোয়ামীর ঘরে যেতে হচ্ছে সেরেফ প্যাটের দায়ে!

দুলালীর জন্মগত নাম ধোলী। গায়ের রংটা কিছু ফর্সা হওয়ায় পাড়া

প্রতিবেশীরা ওর নাম রাখে ধোলী। ধোলীর মা অবশ্য ধোলী না বলে ওকে দেলী বলে ডাকতে থাকে। পরবর্তীতে ওর নাম হয় দুলালী। দুলালী নামটা দুলালীর নিজের রাখা নাম।

সে যাই হোক, ছোটকাল থেকেই দুলালীর লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হওয়ার বড়ই ইচ্ছে। দল বেঁধে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় যায় দেখে দুলালী তাদের নিকট থেকে একটা পুরাতন বাল্য শিক্ষা বই চেয়ে নিয়ে সেও চুরি করে পাঠশালায় যাওয়া শুরু করে। কিন্তু দু'তিন দিন না যেতেই টের পেয়ে ক্ষেপে যায় দুলালীর মা। বাল্যশিক্ষা বইখানা টান মেরে তার হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলে– ইঃ! মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে। প্যাটে ভাত নাই, পাঠশালায় ভর্তি হইয়া বিদ্বান হওয়ার শখ!

অতঃপর গোবরের একটা ডালি ধরিয়ে দিয়ে বলে– যা, মাঠে যা। মাঠে গিয়া ডালি ভরে গোবর কুড়িয়ে আন। গোবর দিয়া দেলে (কেঁড়ে)

বানিয়ে না বেচলে, মুখে ভাত যাবে কি কইরা। পাড়ার সবাই গোবর শুকাইয়া ঘুঁটে বানান শুরু কইরাছে। বাড়ির উপর কি গোবর আজকাল পাওয়া যায়?

শুরু হয় দুলালীর গোবর কুড়ানো কাজ। এভাবেই সে একটু বড় হয়ে উঠে আর গায়ের রংটা ফর্সা হওয়ায় পাঁচ জনের নজর পড়ে যায় তার উপর। বিশেষ করে জকি মণ্ডল তার দোজবর ছেলে কোকিল মণ্ডলের জন্যে দুলালীকে খুব পছন্দ করে ফেলে আর বারবার ঘটক পাঠায় দুলালীদের বাড়িতে।

অবশেষে জকি মণ্ডলের হাত এড়াতে পারে ধোলীর মা। বরটা দোজবর অর্থাৎ একবার বিয়ে করা বরটা বড়সড় মানুষ আর ধোলী ওরফে দুলালী নাবালিকা হওয়া সত্ত্বেও জকি মণ্ডল বলে– চিন্ত করো না ধোলীর মা। শাদির পানি গায়ে পড়লে নাবালিকা সাবালিকা হয়ে উঠতে আর কয়দিন। রাজী হয়ে যাও, মেয়ে তোমার সুখেই থাকবে।

সুখ যা হোক, দুই বেলা দুই মুঠো পেটপুরে খেতে পাবে মেয়েটা, এই চিন্তাতেও রাজী হয়ে গেল দুলালীর মা। আর তখনই কোকিলের সাথে শাদি হয়ে গেল দুলালীর। কিন্তু বাপের দেখা এই নিতান্তই শিশুপাত্রী দেখে বেজায় নাখোশ হলো কোকিল। বাপ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখে ধোলীকে লাগিয়ে দিলো সংসারের কাজে। সংসারের যাবতীয় কাজ তার ঘাড়ে দিয়ে দুলালীকে আটকিয়ে রাখে জকি মণ্ডল। মায়ের বাড়িতে আর একদিনও যেতে দেয় না। গোটা দুই দুইটি বছর পরে যখন যেতে দেয়, তখন একেবারেই মায়ের বাড়িতে ফিরে আসে ধোলী, ওরফে দুলালী। কারণ, তাকে তালাক দিয়ে কোকিল আর একটা সদ্যবিধবা তরুণীকে বিয়ে করে মোটা অংকের যৌতুক পাওয়ার লোভে। কোন সতীনের ঘর করবে না বলে তরুণীটি শর্ত দেয়ায় কোকিল তালাক দিয়ে বিদায় করে দুলালীকে।

ধোলী অবশ্য ইতোমধ্যেই বেশ ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছে। এবার তার উপর নজর পড়ে পাড়ারই এক ষাটের উপরে বয়স ময়েন উদ্দীন ওরফে ময়েন খাঁ নামের এক প্রায় বৃদ্ধ লোকের। স্ত্রী মারা যাওয়ায় আর বেটাপুত সব পৃথক হয়ে পৃথক বাড়িতে পার হওয়ায় ময়েন খাঁ একাই থাকে বাড়িতে। তাকে দেখাশুনা করার কোন লোক না থাকায় ময়েন খাঁ দুলালীর মায়ের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে শাদি করে দুলালীকে। নিজের কপাল মানিয়ে নিয়ে দুলালী মনোযোগ দিয়েই এই বৃদ্ধের সংসার করতে থাকে। কিন্তু এটাও নসীবে তার সয় না। বছর চারেক পরেই মারা যায় ময়েন খাঁ, আর ধোলী ফের বিধবা হয়ে মায়ের সংসারে ফিরে আসে।

কিন্তু মায়ের সংসারে সেই পূর্ববৎ হা-অন্ন হা-অন্ন অবস্থা। ধোলী ইতিমধ্যেই পুরোপুরি যুবতী হয়ে উঠেছে। আয় উপায়ের জন্যে সে এবার রাস্তায় নেমে আসে আর পুরোপুরি পাল্টে ফেলে নিজের নাম।

ধোলী বা দেলী বাদ দিয়ে নিজে সে নিজের নাম রাখে দুলালী। আর এই দুলালী নামটাই সবাইকে সে জানায়।

কিন্তু আয় উপায়ের ধান্দায় পথে নেমে এসেই এক দালালের হাতে পড়ে দুলালী। গার্মেন্টসে কাজ পাইয়ে দেবে বলে সেই দালালটা দুলালীকে এনে এক নারী পাচারকারীর হাতে তুলে দেয়। অনেকটাই নসীবগুণে এই সময় পাচারকারীরা সদল বলে ধরা পড়ায় অন্যান্য মেয়েদের সাথে দুলালীও রক্ষে পায়।

অতঃপর দুলালী গার্মেন্টসে যাওয়ার চেষ্টা করেও সুবিধে করতে পারে না। তার চেহারাটা বেশ আকর্ষণীয় হওয়ায় তাকে গার্মেন্টসে ঢুকিয়ে দেয়ার নামে সবাই কেবলই ছিঁড়ে খুবলে খাওয়ার উদ্যোগ নেয়। শেষ প্রতারকের হাত থেকে ফসকে এসে সে কি করবে কোথায় যাবে ভেবে গার্মেন্টসের গেটে বসে অশ্রুপাত করারকালে আবদুর রহমান নামের এক সদাশয় অধ্যাপকের নজরে পড়ে। তার দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে এই অধ্যাপক সাহেব দুলালীকে তাঁর নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল মাইনের ঝিয়ের কাজে নিয়োগ করে। অধ্যাপক সাহেবের সংসারটা খুব ছোট, কাজও অল্প। ফলে এখানে এসে বেশ আরাম আয়েশের সাথে সুখেই দিন কাটতে থাকে দুলালীর। এতদিন পরে সে প্রকৃত সুখের মুখ দেখতে পায়।

কিন্তু কথায় বলে, সুখে খেতে ভূতে কিলায়। পেটের ক্ষুধা মিটে যাওয়ার সাথে সাথে জেগে উঠে তার যৌবনের ক্ষুধা। প্রেম করার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠে। ফলে কাঠমিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি এবং বাস-ট্রাকের হেলপারদের সাথে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে জোরদারভাবে প্রেম চালিয়ে যেতে থাকে। টের পেয়ে অধ্যাপক সাহেব তাকে বার বার সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও শুভবুদ্ধির উদয় হয় না দুলালীর। একদিন সে ট্রাকের এক ভিন্নদেশী হেলপারের হাত ধরে অধ্যাপক সাহেবের গৃহ ত্যাগ করে এবং ঐ হেলপারের ভাড়া করা খুপরী ঘরে এসে উঠে। ঐ হেলপারকে বিয়ে করে কয়েকদিন বেশ সুখেই কাটে তার। কিন্তু ঐ কয়েকটা দিন ফূর্তিফার্তা করে ঐ বিদেশী হেলপারটা চম্পট দিয়ে নিজ দেশে চলে যায়, আর ফিরে আসে না। দুলালী তখন অন্তঃস্বত্বা।

নিরুপায় হয়ে দুলালী আবার ঐ অধ্যাপকের কাছে ফিরে আসে আর অধ্যাপকের হাতে পায়ে ধরে তার বাসাতেই আবার কাজে বহাল হয়। এখানেই সে সন্তান প্রসব করে আর সেই সন্তান নিয়ে আরামে ও নিরাপদেই রয়ে যায় অধ্যাপকের বাসায়।

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে আর ইল্লত যায় না ধুলে। খেয়ে দেয়ে ফের সবল হয়ে উঠার পর আবার প্রেমভাব জেগে উঠে দুলালীর মধ্যে। এবার সে অধ্যাপকের বাড়িরই কাজের লোকের প্রেমে পড়ে আবার সে অধ্যাপকের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ঐ কাজের লোকের হাত ধরে।

ফলাফল যা হবার তাই হয়। সেই কাজের লোকটাও আর একটা সন্তান দুলালীর গর্ভে দিয়ে কেটে পড়ে নীরবে। দুলালী আর কোনই খোঁজ পায় না তার। আর স্থানও পায় না ঐ অধ্যাপকের বাসায়। মায়ের বাসায় ফিরে এসে সে খোঁজ পায় না মায়েরও। অবশিষ্ট দুই সন্তান নিয়ে তার মাও যেন কোথায় চলে গেছে পেটের দায়ে।

দুলালী অগত্যা ফিরে আসে রাজধানীতে। ইতিমধ্যেই আর একটা সন্তান প্রসব করে দুলালী। ফলে সে আর কোন কাজ পায় না কোথাও। দুই দুইটে শিশু সন্তান দুলালীকে আর ঝিয়ের কাজও দেয় না কেউ। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে অবশেষে দুই দুইটি সন্তান ও একটা ভাঙ্গা থালা নিয়ে এক ওভার ব্রীজের নিচে এসে বসে যায় দুলালী। ঐ ভাঙ্গা থালাটা বাড়িয়ে ধরে সে ভিক্ষে করে দিনভর আর রাত্রিকালে ও ঝড়-বাদলে ঐ ওভার ব্রীজের নীচেই দুই বাচ্চা নিয়ে এক কোণে সে শোয়। এভাবেই এখন দিন কাটে দুলালীর। আর দুলালী এখন এখানেই থাকে।

বন্যা

অভ্র ওয়াসিম

বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় জোনাকিরা ঘরে আশ্রয় নেয়। তারা নির্ভাবনায় উড়ছে আর জ্বলছে। ভাগ্যিস বিদ্যুৎ নেই। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ রেখার মত তোমার মুখখানি অতুলনীয় সুন্দর। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। তুমি আমার ডান হাত জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখেছো। তোমার তপ্তশ্বাস আমার গ্রীবায় আঘাত করছে। বৃষ্টির শব্দ কমে আসছে। তোমার বুকে হাপরের শব্দ বাড়তে থাকে। দূরে ব্যাঙ ডাকছে। এই রাতে তার সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলেছে। বৃষ্টির শব্দ আবারো বাড়ছে। সব ডুবিয়ে দেবে। পথ, ফসলের মাঠ, ঘরের আঙিনা কিছুই বাদ যাবে না। জোনাকির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। তুমি আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছো। বুকের মাঝখানে আমার হাতটা গভীর মমতায় জড়িয়ে রেখেছো। বিদ্যুৎ রেখার আলো তোমার চোখে পড়ে। কিশান্ত আর সুন্দর চোখ তোমার। রাত বাড়ছে। বৃষ্টির শব্দও বাড়ছে। হঠাৎই দমকা বাতাস শুরু হলো। আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম। মড়মড় শব্দে গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল।

সৈকতের বদঅভ্যাস, মধুর অভ্যাস দুটোই মিথিলা বেশ উপভোগ করে। সাধারণত সকালে সৈকতের প্রথম ঘুম ভাঙে। সে মিথিলার ঘুম ভাঙায় না। চা-টা ভালোই বানায়। সকালের ধূমায়িত চা টি-পটে অপেক্ষা করে মিথিলার ঘুম ভাঙার জন্য। সৈকত শুধু জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়। আর সূর্যের আলোক রেখা ঘরে এসে মিথিলার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সে এটা মোটেও পছন্দ করে না। সে চায় সৈকত ওর ঘুম ভাঙাবে। কিন্তু সৈকত মিথিলার সকালের বিরক্তকর হাসিটা দেখতে চায়। অনুযোগটাও হাসি মুখে মেনে নেয়।

মিথিলার গায়ের রং শ্যামলা হলেও ও চোখ জুড়ানো ভালোলাগা। ওর উপস্থিতি আশ্চর্যজনক সুন্দর। আপ্যায়ন, অন্যের সাথে কথা বলা, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সংবেনশীলতা সবক্ষেত্রে সহজ ও আন্তরিক। সৈকতের সবটুকু আবেগ মিথিলার জন্য তোলা। মিথিলা সেই আবেগ থেকে খরচ করে বেহিসাবি। তবে সম্পদ কমে না। ভালোবাসার শিকলটা আরো মজবুত আর প্রাণময় হচ্ছে।

মিথিলা দাদার বাড়ি এসেছে সৈকতকে নিয়ে। দাদা বেঁচে নেই। দাদী বেঁচে আছেন এবং রাজত্ব ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছেন। ওর ছোট চাচা এক রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। চাচী এ বাড়িতেই থাকেন। তার একটা ছেলে আছে। খুব সুন্দর দেখতে। মিথিলা ওকে রাজকুমার বলে ডাকে। পুরনো দোতলা বাড়ি। নিয়মিত যত্ন নেয়াই বাড়িটির গৌরব একটুও কমেনি।

মিথিলার চোখ আলোর তীব্র তা অনুভব করে। ডান পাশে কাত হতেই চোখ খুলে যায়। জানালায় পর্দা সরানো। ঝকঝকে রোদ। রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে সেটা মনে পড়ে মিথিলার। আকাশে কোন মেঘ নেই। রাতে গাছের ডাল ভেঙেছে। মিথিলা জানলায় দাঁড়িয়ে এ গাছ ও গাছ দেখতে থাকে। সব গাছই ঠিক আছে। বড় জাম গাছটায় কয়েকটা পাখি ডানা ঝাড়ছে। রোদে পাতাগুলো চিকমিক করছে। সৈকত কোথায়?

সৈকতকে দেখতে না পেয়ে মিথিলা নিচে নেমে আসে। মানে কি? উঠোন পানিতে ডুবে আছে। পানি কোথা থেকে আসলো। রাতে এতো বৃষ্টি হয়েছে? মিথিলা অবাক হয়ে ভাবছে। দাদী ইজি চেয়ারে মুখ ভার করে বসে আছে। তার প্রথম দুর্ভাবনা কাজলীকে নিয়ে। কাজলীকে কোথায় রাখবে। ওর ঘরটায় যে হাঁটু পানি। কাজলীর বাচ্চাটা ইতোমধ্যে বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে। খাঁটি ও টাটকা দুধের যোগান দেয় কাজলী। রাজকুমার মিথিলাকে প্রশ্ন করে, বন্যা কি আপু? মা বলেছে বন্যা হয়েছে। বন্যা হলে সব ডুবে যায়। ফসল তলিয়ে যায়। পুকুর ভেসে যায়। রাজকুমারের কোন কথায় মিথিলার কানে ঢোকে না। মিথিলা কখনো বন্যা দেখেনি। রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করে, সৈকত কোথায়? দেখেছিস?

রাজকুমার : ভাইয়া তো বন্যা দেখতে গেছে।

মিথিলা : কার সাথে গেলো?

রাজকুমার : কাশেম ভাইয়ের সাথে।

মিথিলা : কখন?

রাজকুমার : তখন নয়টা বাজে।

মিথিলা : কেউ নিষেধ করেনি? মিথিলা দাদীর কাছে ছুটে যায়।

মিথিলা : তুমি সৈকতকে যেতে দিলে কেনো ও সাঁতার জানে না। মিথিলার চোখে পানি এসে যায়।

সৈকত একটা ডিঙ্গি নৌকায় করে বন্যা দেখছে। ওর কাছে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। ও কখনো বন্যা দেখেনি। প্রকৃতি ম্যাজিসিয়ানের মত সব পাল্টে দিয়েছে। কাল বিকেলে যে মাঠ সবুজে ঢাকা ছিল আজ পানিতে ডুবে আছে। পানির ছোট তরঙ্গে রোদের খেলা চলছে। আলোর ঝলক প্রতিফলিত হচ্ছে। পাশের একটা বাবলা গাছে কয়েকটা সাপ আর বেশ কিছু ইঁদুর আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে নড়াচড়া নেই। দুই দলেরই আবাস নষ্ট হয়েছে। বিপদে এরা বন্ধু! কাশেম সৈকতকে একটা মরা ছাগল ভেসে থাকতে দেখায়। সৈকত সাঁতার জানে না। কৌতূহলবশত বেরিয়ে পড়েছে। মিথিলার কথা মনে পড়ে।

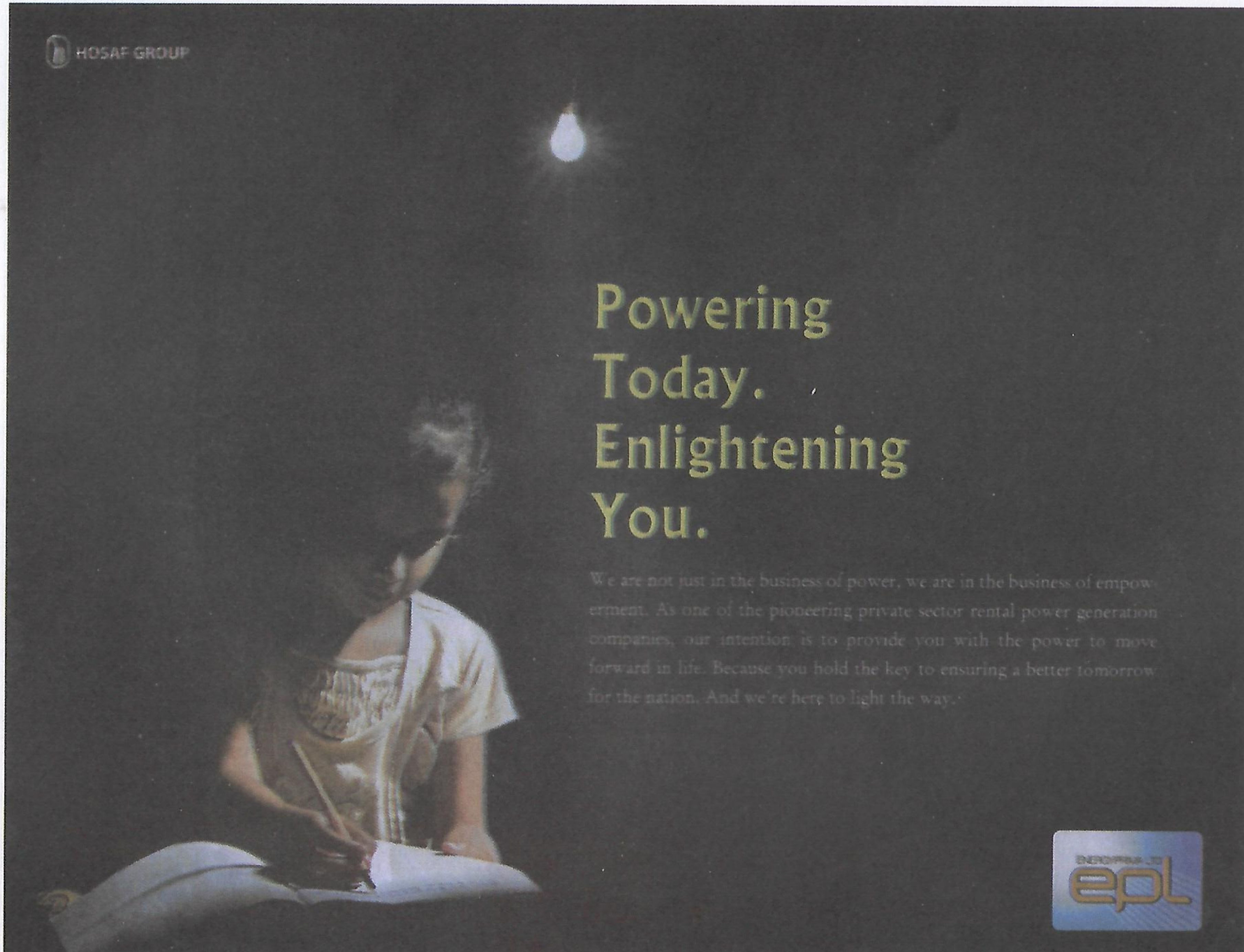
HOSAF GROUP
Powering
Today.
Enlightening
You.
We are not just in the business of power, we are in the business of empowerment. As one of the pioneering private sector rental power generation companies, our intention is to provide you with the power to move forward in life. Because you hold the key to ensuring a better tomorrow for the nation. And we're here to light the way.
epL

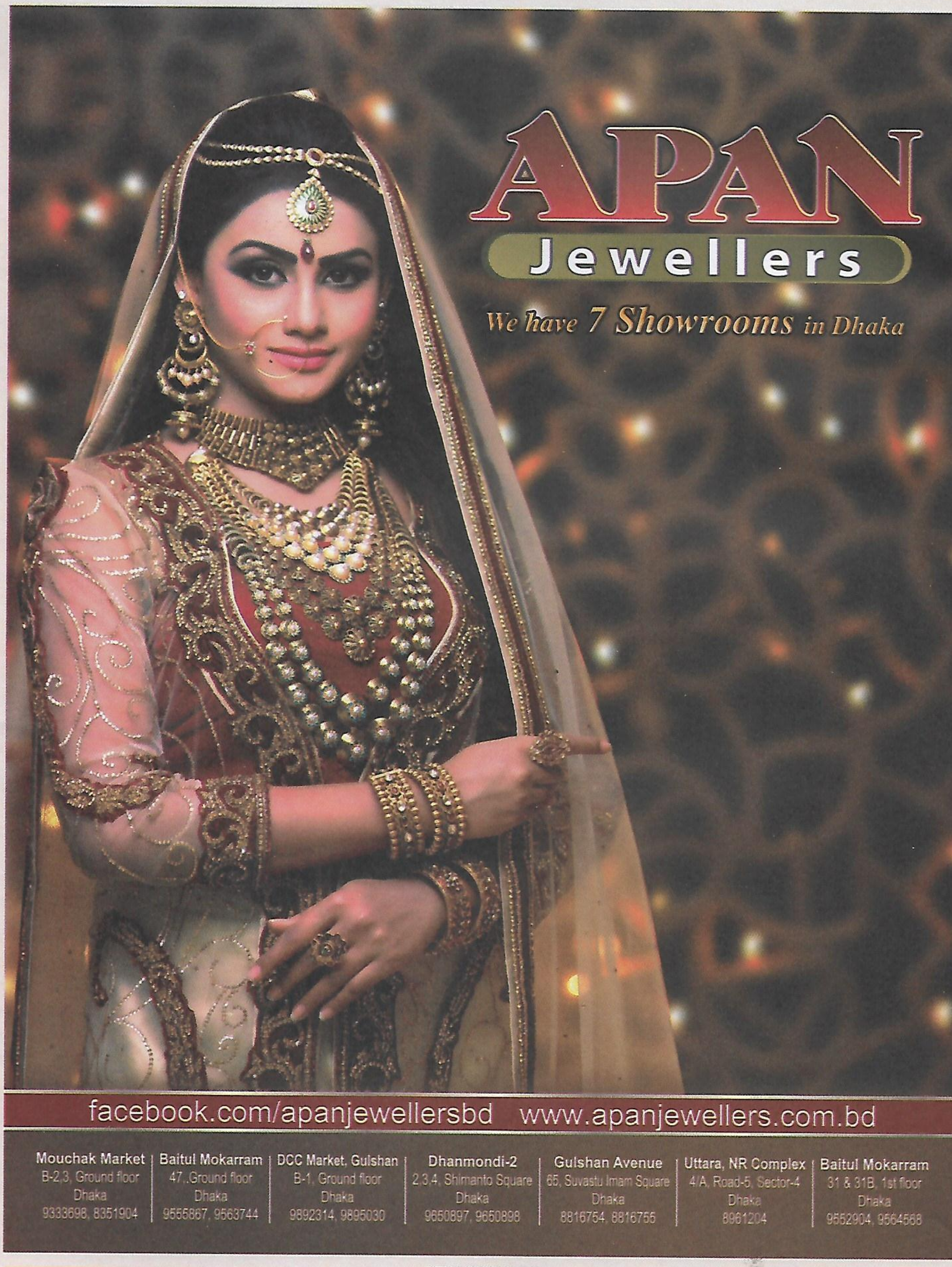
APAN
Jewellers
We have 7 Showrooms in Dhaka
facebook.com/apanjewellersbd www.apanjewellers.com.bd
Mouchak Market
B-2,3, Ground floor
Dhaka
9333698, 8351904
Baitul Mokarram
47, Ground floor
Dhaka
9555867, 9563744
DCC Market, Gulshan
B-1, Ground floor
Dhaka
9892314, 9895030
Dhanmondi-2
2,3,4, Shimanto Square
Dhaka
9650897, 9650898
Gulshan Avenue
65, Suvastu Imam Square
Dhaka
8816754, 8816755
Uttara, NR Complex
4/A, Road-5, Sector-4
Dhaka
8961204
Baitul Mokarram
31 & 31B, 1st floor
Dhaka
9552904, 9564568

ফোনটাও সাথে আনেনি। সৈকত ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে। নৌকার সামনে দিয়ে একটা গরুকে সাঁতরে চলে যেতে দেখল। সামনের গ্রামের দরিদ্র মানুষদের ঘরগুলোর শুধু চাল দেখা যাচ্ছে। একটা টিনের চালে দুটো শিশুকে দেখা যায়। সৈকত বুঝতে পারে না গ্রামের লোকগুলো বেঁচে আছে কিনা? চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। এক রাতের বৃষ্টিতে এতো পানি!

দুপুর হয়েছে। সকালে নাশতা করে আসেনি। গরমও সহ্য হচ্ছে না। সৈকত কাশেমকে নৌকা ঘুরাতে বলল। বাড়িতে যে বিপদ অপেক্ষা করছে তা ভালভাবেই টের পাচ্ছে সৈকত।

মিথিলা উপর নীচ করছে। একবার পানিতে নেমে গিয়েছিল। একটা বেজিকে সাঁতরাতে দেখে ফিরে এসেছে। একজন তাকে বলেন, একজন ভদ্রলোককে কাশেমের সাথে নৌকায় যেতে দেখেছে। মিথিলা ভীষণ ভয় পায়। সৈকত সাঁতার জানে না। একটু বৃষ্টিতে ভিজলেই যার ঠাণ্ডা লাগে। সকালে নাশতা হয়নি মিথিলার। দাদীর বকাঝকাতেও কোন কাজ হচ্ছে না। মিথিলার কোন চেতনা নেই।

রাজকুমার পিছপিছ ঘুরছে। কাজলির দুধ দোহানো হয় নি। মাঝেমাঝে হাম্বা হাম্বা করছে। বাছুর দড়ি টানাটানি করছে; তারও খিদে লেগেছে। মিথিলা আপন মনে বকবক করে। ছোট চাচী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। বন্যার পানি তেমন বিপজ্জনক নয়। কাছাকাছি কোন নদী নেই। ও চলে আসবে। সাথে কাশেম আছে। আর নৌকায় গেছে, বিপদের কারণ নেই। কিন্তু মিথিলা কিছুই বুঝতে পারে না। ওর শুধু মনে হয় সৈকত নেই। সৈকত যে আছে এই ব্যাপারটা মিথিলার মাথা থেকে হারিয়ে গেছে।

ভেজা পোশাক শুকিয়ে গেছে পরনে। চাচী পোশাক এনে দিলেও মিথিলা পোশাক পাল্টায় না। কয়েকবার ছাদে উঠে সৈকতের অনুসন্ধান করে। বিষয়টা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেন সৈকত হারিয়ে গেছে। কাজের মেয়েটি আসেনি। তাদের ঘরটুকুও ডুবে গেছে। আশ্রয় এখন সবচেয়ে দামী।

দাদী : কাঁদিস না। যা জেদী ছেলে। আমার বারণ শুনলো না। একাই পানিতে নেমে গেল। আমি কাশেমকে ওর সাথে পাঠিয়েছি। ফিরে আসবে। ভাবিস না বুবু।

মিথিলা দৌড় দিয়ে দোতলায় উঠলো। সৈকতকে ফোন দিল। সৈকতের ফোন ঘরেই বেজে উঠলো। সৈকত মোবাইল ফোন না নিয়েই বন্যা দেখতে বের হয়েছে। মিথিলা বিছানায় বসে পড়ল। চোখের পানি চোখের কিনারা ছাপিয়ে কোলে পড়ছে।

সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে গরুগুলো। ছাগল পানি সহ্য করতে পারে না। তাদেরকে ঘরের চালে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। বৃষ্টি হলেই বিপদ। অনেকেই ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। ঘরে পানি উঠে চৌকি পর্যন্ত ডুবে গেছে। একটা দুই বছরের শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। তাকে কবর দেয়ার মত জায়গা নেই। কবর দেয়ার জন্য উজানে নানা বাড়ি নেয়া হয়েছে। ঘরের চাল ডাল নষ্ট হয়ে গেছে। হাড়ি-পাতিল কাপড়-চোপড় নিয়ে সবাই বেড়িয়ে পড়েছে আশ্রয়ের সন্ধানে।

গরিব মানুষদের সঞ্চিত টাকা থাকে না। দিন আনে দিন খায়। তাদের সঞ্চয়ের মাধ্যম গরু ছাগল। তাও আজ বিপন্ন। মুরগিগুলো গাছের ডালে, টিনের চালে অবস্থান নিয়েছে। খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে। কাশেম সৈকতকে বলে, মানুষজন বাঁধে আশ্রয় নিচ্ছে।

মিথিলা বারান্দায় চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে বসে আছে। রোদ ওর গায়ে পড়ছে। ঝকঝকে রোদে গাপুড়ছে মিথিলার সে দিকে কোন খেয়াল নেই। মনে ঝড় বইছে। সৈকত তাকে না জানিয়ে এমন বিপদের মধ্যে যেতে পারল? বাড়িতে শোকের ছায়া। মিথিলা কোন সান্ত্বনা মানে না। সেও তো সাঁতার জানে না। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সৈকতের মিথিলার কথা মনে পড়ল। এতোক্ষণে সৈকত বুঝতে পারল তার সাঙ্ঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। মিথিলাকে কি করে বোঝাবে যে, সে কোন কিছু না ভেবেই বন্যা দেখতে বেরিয়েছিল।

এরই মধ্যে তাদের নৌকা বাড়ির ঘাটে এসে ভেড়ে। মিথিলা তেমনই চেয়ারে বসে থাকে। চোখ বন্ধ। দাদী হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এলেন। খুব দুঃখ করে তিনি বললেন, আ হা! মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। না খেয়ে এভাবে কাউকে কিছু না বলে বের হয়।

মিথিলার দাদী কাশেমকে খুব বকাবকি করতে লাগলেন। মিথিলা কিছু না বলে দোতলায় উঠে গেলো। দাদী সৈকতকে ইশারা করে উপরে যেতে।

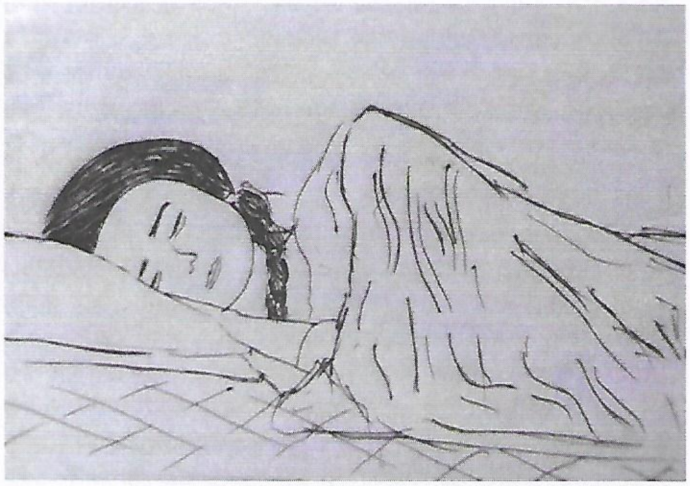

মিথিলা বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে আছে। সৈকতের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। ও বুঝতে পারে না বউয়ের অভিমান কিভাবে দূর করতে হয়। পেটে ক্ষুধা বউয়ের কথা বন্ধ। বাইরে বন্যা, অসহায় মানুষ। সৈকতও অস্থির। চুমু দিতে যেয়ে থেমে যায়। সারা দিন বাইরে বিনা গোসলে চুমু, পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়বে। সৈকত সময় নষ্ট করে না। গোসলের জন্য বাথরুমে যায়।

সৈকত গোসল করে এসে দেখে মিথিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত মিথিলাকে অন্যরকম সুন্দর লাগে। সৈকত মিথিলার কপালে আলতো করে ডান হাত রাখে। শীতল স্পর্শে মিথিলা একটু নড়ে ওঠে কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে না। সৈকত মিথিলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা চুল সরিয়ে দেয়। চুমু দিতে ঝুঁকে পড়তে দরজায় রাজকুমারকে দেখা গেলো। দাদী টেবিলে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এই প্রথম বউয়ের অভিমানের শিকার হলো। বুঝতে পারে না বউকে ডাকবে কি না। রাজকুমার ইশারায় বলে ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। নিরবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। দরজার কাছ থেকে একবার ফিরে দেখে।

রান্নার বেশ অসুবিধা হয়েছে। তবুও যথেষ্ট আয়োজন হয়েছে। ছোট চাচী রান্না করেছেন। সৈকত ছোট মাছ খেতে পারে না বলে বড় মাছ রান্না হয়েছে। রাজকুমার বলে, আপু ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট চাচীকে দেখলে সৈকতের মন খারাপ হয়ে যায়। এতো অল্প বয়সে বিধবা

হয়েছেন। রাজকুমার আর সৈকত বসে খাচ্ছে। খুবই চুপচাপ। মিথিলাকে রেখে কখনো সৈকত খায়নি। তাই খাওয়ায় কোন স্বাদ পাচ্ছে না। চাচী বিষয়টা স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে। সৈকত সামান্য খেয়েই উঠে পড়ল। বন্যার স্রোত মনের ঘরে ঢুকে পড়ে। কাশেম কাজলির দুধ দোহাচ্ছে।

সৈকতের যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল। মিথিলা ছাদে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে। চারিদিকে থৈ থৈ পানি। অশ্বত্থ গাছে পাখিদের ভিড়। বেশিরভাগ পাখি চুপচাপ বসে আছে। সৈকত ছাদে এসে মিথিলার পাশে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি বেশ স্বস্থিকর মনে হনে হচ্ছে। রাজকুমার ছুটোছুটি করছে। সেও মিথিলার কাছে আসে। মিথিলা তাকে বলে, জরিনাকে একটা চেয়ার দিতে বল। রাজকুমার ছুটলো চেয়ার আনতে। জরিনা এ বেলায় এসেছে। সৈকত মিথিলার পেছনে চেয়ারে হাত রাখে। কোন কথা বলে না। রাজকুমার ফিরেছে। জরিনা চেয়ার দিয়ে যায়। রাজকুমার বলে, ভাইয়া বন্যা কি?

সৈকত বলে, বন্যা মানে বোধ হয় সবকিছু পানিতে ডুবে যাওয়া। নদী ভরে উপচে গেলে, পাহাড়ের পানি নেমে আসার কারণে, অনেক বৃষ্টির ফলে ফসলের মাঠ, পুকুর, কখনো কখনো ঘর-বাড়ি পানিতে ডুবে যায়। তখন আমরা বন্যা হয়েছে বলে থাকি। মানুষের অনেক কষ্ট হয়। যেমন এখন তুমি দেখছ।

মিথিলা চেয়ার ছেড়ে ছাদের অন্য কোণায় চলে যায়। সূর্য রক্তিম হতে শুরু করেছে। পানিতে বর্ণিল ছটার সৌন্দর্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মিথিলা সারাদিন কথা বলেনি সৈকতের সাথে। জরিনা চা দিয়ে যায়। মিথিলা চেয়ারে এসে বসে। সৈকত রাজকুমারের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। বলে, আমরা নৌকা নিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় দেখি একটা ভেলায় করে হাড়ি-পাতিল নিয়ে কয়েকজন আসছে। একজন মহিলাও ছিল। এদিকে রাস্তা ভেঙ্গে পানির স্রোত বইছে। ওরা বিষয়টা গুরুত্ব দেয়নি। স্রোতের কাছে ভেলাটা হঠাৎ স্রোতের টানে চলে গেল। হাড়ি পাতিল গেল ভেসে। মানুষগুলো গেলো পড়ে। মহিলাটা হাড়ি হাড়ি বলে চিৎকার করছে। কারণ হাড়িও তো ভেসে যাচ্ছে। রাজকুমার খুব মজা পায়। মিথিলা অস্বস্তি বোধ করে। সন্ধ্যা দিনের আলো গ্রাস করছে। এই অজুহাতে রাজকুমারকে পড়তে বসতে বলে। বিদ্যুৎ বিকেলে একটু এসে আবার চলে গেছে। গরমও পড়ছে। গ্রামে আট দশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। মিথিলার একটা হাত সৈকত নিজের কাছে নিতে গেলো। মিথিলা কিছু বলল না। সৈকত কৈফিয়ত দিতে শুরু করে। মিথিলা চুপচাপ উঠে গেল। সৈকতের অসহ্য লাগে। পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়। মিথিলা ছায়ার মত ছাদে পায়চারী করছে। সৈকত উদাস হয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। একটা একটা করে বাদুর দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যাচ্ছে। কিছু সময় ধরে সৈকত বাদুর উড়া দেখলো।

কাল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা গিয়েছিল। আজকের রাত আসে নিরবে। অনেকটা গোপনে। মিথিলার মত অভিমানে। আকাশে একটা দুইটা তারা মিটমিট করছে। কথাহীন ভলোবাসার ফাঁদে পড়ে সৈকত নাজেহাল। বিদ্যুৎ আসেনি এখনো। কাশেমের গানের গলা ভাল। ওকে ডেকে গান শোনা যায়। কিন্তু মানুষের কষ্টের দিনে গান শোনা ঠিক হবে না। মোবাইলে মায়ের সাথে কথা বলে। মা উদ্বিগ্ন। টেলিভিশন সংবাদে বন্যার ছবি দেখেছেন। গাছের পাখিগুলো নড়াচড়া করছে। তারাও হয়তো ভাল নেই।

মিথিলা এরই মধ্যে নিচে চলে গেছে। চাচীর সাথে গল্প করছে। তিনি রাতের রান্না করছেন। দাদী তাল পাতার হাতপাখা নিয়ে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন। রাজকুমার চার্জার লাইটের আলোয় শব্দ করে পড়ছে।

বিদ্যুৎ এসেছে। সৈকত বিছানায় শুয়ে আছে। মিথিলা ব্রাশ করছে। জরিনা গরম দুধ রেখে গেছে। দুধ সৈকতের মোটেও পছন্দের না। তবুও কোন কথা না বলে দুধ খেয়ে নেয়। ফুল স্পিডে ফ্যান চলছে। ঘরে ডিম আলোর ব্যবস্থা নেই। চাঁদ দেরিতে উঠবে। মিথিলার মান ভাঙ্গার চেষ্টা করে। মিথিলা শক্তি খাটায়। শেষ পর্যন্ত হার মানে। সৈকতের সাথে অংশ গ্রহণ করে। সৈকতের বন্ধুর দেয়া ফর্মুলা কাজে লাগে। যদিও কথা হয় নাদু' জনের মধ্যে। চাঁদ উঠেছে। মেঘে ঢাকছে আবার মেঘ সরে যাচ্ছে। মেঘের কারণে চাঁদের চারপাশে আলোর বলয় সৃষ্টি হচ্ছে। সুন্দর দৃশ্য। সকালের আলো এসে পড়েছে। মিথিলা জানলায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। চুলের পানিতে পেছনের দিকটা ভিজে আছে। মিথিলা স্বাভাবিক গলায় বলে, কই ওঠো। গোসল করে নাও। আজ আমিও তোমার সাথে বন্যা দেখতে যাব। সৈকতের দিনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

রহস্যময় প্রকৃতি। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সবাই দাদীর ঘরে কথা বলছে। দাদী তাঁর জীবনে এমন বন্যা দেখেন নি। আর রাজকুমার তো এতো বৃষ্টিই হতে দেখে নি। চাচীর লজ্জার বিষয়টা সৈকতের চোখে পড়ে। চোখাচোখিও হয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

রাজকুমার : ভাইয়া বন্যা কেন হয়?

সৈকত : বেশি বৃষ্টি হলে, নদীর পানি বৃদ্ধি পেলে, পাহাড়ের পানি নেমে আসলে মাঠঘাট ডুবে যায়। তখন আমরা বন্যা বলি।

রাজকুমার : বৃষ্টি না হলে নদী ভরে যায় কি করে?

সৈকত : আমাদের নদীগুলো অন্য দেশে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যেয়ে মেশে। ফলে ভারত, চী ন অধিক বৃষ্টি হলে আমাদের দেশে বন্যা দেখা দেয়।

রাজকুমার : এবার এত বৃষ্টি কেন হচ্ছে?

সৈকত : সেটাও আমি ভাবছি। খালবিল শুকিয়ে গেছে। মেঘের সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে!

দাদী : বৃষ্টির বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সুরা লুকমানে উল্লেখ আছে। আমার মনে হয় আল্লাহ আমাদের পাপের শাস্তি দিচ্ছেন।

চাচী উঠে গেলেন। মিথিলা জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। একটা প্রচণ্ড বজ্রপাত হয়। মিথিলা ভয় পেয়ে জানালা থেকে সরে আসে। বৃষ্টিতে বাঁধের লোকের কষ্ট বাড়ছে। গরীব ও প্রান্তিক কৃষকরাই বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে। স্কুলগুলোতেও পানি উঠেছে। কম দামে গবাদি পশু বিক্রি করে দিচ্ছে। ডুবে যাওয়া ধান পচে পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেবে। মাছ মরে যাবে। ফসল নেই মাছ নেই গবাদি পশু নেই অভাব তেড়ে আসছে। সরকারি সাহায্য কতটা সহায়ক হবে। এতটুকুই ভাল খবর যে, বন্যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ কি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হতে চলেছে। সৈকতের মন খারাপ হয়ে যায়। ও মানুষের এমন কষ্ট কখনো দেখেনি। ওর চোখে ভেসে ওঠে কলাগাছের ভেলাটা স্রোতের টানে ভেসে গেলো। মহিলাটা চিৎকার করছে, আমার হাঁড়ি, আমার হাঁড়ি।

০১.১১.১৭, রাত ৮:৩০

ঢাকা।

উপন্যাস

রাত পোহাবার কত দেরি

মুহাম্মদ ফজলুল হক

এক

রুচিডং থানা সদর। রাখাইন মুসলিম এপ্রোভাল অফিস। রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিয়ে, চিকিৎসা, পড়াশোনার অনুমতি পত্র দেয়া হয় এই অফিস থেকে। আব্দুল আজিজ প্রতি মাসে একবার করে আসে। গত বার মাসে বার বার এসেছে। দাদাজানের চোখে ছানি পড়েছে। মংডু জেলা সদরে নিয়ে গিয়ে তার চোখ অপারেশন করাতে হবে। আরো একটা আর্জি আছে। চাচাত বোন ফাইজার সাথে তার বিবাহ দানের অনুমতি। বার বার তাকে হতাশ হয়েই ফিরে যেতে হয়েছে। দাদাজানের চোখের ছানির পুরুত্ব বেড়েছে, ফাইজার বুকের গহীনে লুকিয়ে থাকা দীর্ঘশ্বাসের দৈর্ঘ্য বেড়েছে- কিন্তু এপ্রোভাল অফিসের কেরানি ও অফিসারের কোন ভাবান্তর আনতে সে পারেনি।

দু'কামরার অফিসের সামনের কামরাতে বসেন উ মং। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের কাঁচাপাকা চুলের হেড কেরানি। তার পাশের চেয়ারটিতে বসেন ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর বয়সের থং সুন। তার সহকারি। তাদের পিছনে কাঁচের দেয়াল ঘেরা কেবিনটা অফিসারের। উ মং-এর আলুথালু বেশভূষা আর ঢুলু ঢুলু চোখের চাহনি দেখলেই বুঝা যায়, অফিসে আসার আগেই এক বোতল সাবাড় করে এসেছে সে। থং সুন-এর চেহারা বেশ ধারালো। সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে সে মানুষের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা করে।

আব্দুল আজিজ বুদ্ধ কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে উ মং-এর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। উ মং একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে আব্দুল আজিজকে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে- কী চাই?

: দাদা, আমার দুইটা পিটিশন দেওয়া আছে।

উ মং মাথা ভাসিয়ে কুতকুতে দৃষ্টিতে আব্দুল আজিজকে পরিমাপ করে।

: কী নাম?

: আব্দুল আজিজ।

: বাঙ্গালী মুসলিম?

: আজ্ঞে না, আমরা রোহিঙ্গা মুসলিম।

উ মং-এর গোঁফের নীচে একটা কৌতুকের ঝিলিক ভাসে।

: খাতাপত্রে এই দেশে রোহিঙ্গা বলতে কোন পদার্থ নাই। তোমাদের কত কসরত করে বুঝানো হচ্ছে যে তোমরা রোহিঙ্গা মুসলিম নও, বাঙ্গালী মুসলিম- কিন্তু কুত্তার বাঁকানো লেজের মতো তোমরা গোঁ ধরে রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা বলেই যাচ্ছো।

: খাতা-কলমে তো যা খুশি তাই লেখা যায়। কিন্তু আমরা ছিলাম এবং আছি, এইটা তো মিথ্যা না।

থং সুন সাপের চোখে শুরু থেকেই আব্দুল আজিজকে দেখে যাচ্ছে। তার কপালে একটা ভাঁজ পড়ে। বিরক্তি নিয়েই সে উ মংকে বলে- বাদ দেন তো দাদা। পাগলের সুখ মনে মনে। নিজেদের রোহিঙ্গা দাবি করে সুখ পাচ্ছে, পাইতে দেন।

: তুমি যখন বলছো বাদ দিতে, দিলাম। আর হে, মনে মনে সুখ পাইতেছো পাও। শুনতেছি চব্বিশ তারিখ নাকি কফি আনানের সুপারিশ প্রকাশিত হবে। শুনতেছি রাখাইনের বাঙ্গালী মুসলমানরা নাকি এইবার নাগরিকত্বও পাবে। তা দেশের বারোটা বাজায়া যদি নাগরিকত্ব দেয়, দিক। আমার কি?

থং সুনের দুই ঠোঁটের কোণে একটা কৌতুক ঝিলিক মারে। বলে- ক্যান কথা বাড়াইতেছেন দাদা। চব্বিশ তারিখ আগে আসতে দেন।

উ মং পদে ও বয়সে বড় হলেও থং সুনকে সমীহ করে চলে। শুধু সে কেন, কাঁচের কেবিনের বসও তার কথার বাইরে যাওয়ার সাহস দেখায় না। কারণ থং সুন মা বা থা'র সদস্য। আর কাগজে-পত্রে লেখা না থাকলেও কে না জানে যে আর্মির পরান ভোমরা হলো মা বা থা। তাই মা বা থা'কে মাটিতে ভর করে চলতে হয় না, আর্মির কোলে কোলেই তাদের অবস্থান।

উ মং বাধ্য ছেলের মতো থং সুনের কথা মেনে নিয়ে কাজে মনোযোগ দেয়। আব্দুল আজিজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে- গ্রামের নাম বল। আর তোমাদের ওক্‌কটা (চেয়ারম্যান) কে সেইটাও বলো।

: গ্রামের নাম পুংনাম শুয়ে। আমাদের ওক্‌কটার নাম ... ...

উ মং উঠে আলমারি খুলে পেটমোটা একটা ফাইল বের করে এনে বসে ফাইল খোলে। বলে- পিটিশন দুইটা কী কী?

: রমজান আলী, বয়স সত্তর। চোখে ছানি পড়েছে। মংডুতে গিয়ে চোখের অপারেশন করাতে হবে।

উ মং খুবই বিরক্ত হয়।

: সত্তর বছর পর্যন্ত তো দুই চোখ ভরে অনেক দেখাশোনা করছে। এখন মরার বয়স হইছে মরতে কও। এতো দেখাদেখির কী দরকার?

আব্দুল আজিজ কোন কথা বলে না। উ মং আবার বলে- আরেকটা পিটিশন যেন কিসের?

: আমার আর আমার চাচাত বোন লাফিসার শাদির অনুমতি।

এই ব্যাপারটাতে বেশ মজা পায় উ মং। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। মুখে একটা আদিরসাত্মক ভাব খেলা করে যায়। চোখে একটা অসভ্য ইশারা করে জিজ্ঞেস করে- পাত্রীর বয়স কত? দেখতে কেমন?

আব্দুল আজিজ দাঁত চেপে সহ্য করে। সহ্য করে যাওয়াটাই তাদের নিয়তি।

উ মং কৈয়ফত চাওয়ার মতো করে বলে- এই রকম গুম মারলা ক্যান?

পাত্রীর বয়স জানার দরকার আছে তো। তোমরা তো আর সাবালিকা-নাবালিকার বাছ-বিচার কর না। নারীদেহ হইলেই হইলো। আর কাঁটায় কাঁটায় দশ মাস হইলেই নতুন আরেকজন পয়দা করে ফেলো। এই কাজে তো তোমরা বিরাট কারিগর।

পাশের টেবিলের থং সুন এবার বেশ বিরক্ত হয়। দাদা, আপনারে বললাম অনুমতি দুইটা দিয়া দেন, আপনি আজাইর‍্যা প্যাচাল চালায়েই যাচ্ছেন।

উ মং একটু অবাক হয়। থং সুনের ভিতরটা মুসলিমবিদ্বেষে ঠাসা। সুযোগ পেলেই দশ-বিশটা জোয়ান রোহিঙ্গাকে কচুকাটা করবে– একদিন কথায় কথায় তাও বলেছে। কিন্তু আজ কেন মথুরা উল্টিয়ে রোহিঙ্গার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে কিছুই বুঝতে পারছে না।

উ মংকে ভাবনার মধ্যে রেখেই থং সুন আব্দুল আজিজকে বলে– এক লাখ কিয়েত ছাড়ো, অনুমতি দুইটা পায়া যাইবা।

আব্দুল আজিজ অসহায় বোধ করে। আজকেই অনুমতি দিয়ে দিবে জানা থাকলে ঘুষের অর্থটা সে অবশ্যই সাথে নিয়ে আসতো। সে কাঁচুমাচু করে বলে– এতো অর্থ তো সাথে নাই।

এবার ভেংচি কাটে উ মং। বলে– অ্যাই মিয়া, আস্ত একটা নারীদেহের মালিক হইবা, বছর না ঘুরতেই সেই দেহযন্ত্র থেকে নতুন রোহিঙ্গা পয়দা করবা– আর আমাদের একটা ছাগলের দেহ কিনার পয়সাও দিবা না, এইটা কোন বিবেচনার কথা হইলো?

উ মংকে পাশ কেটে এবার থং সুন নিজেই বলে– সাথে কত আছে?

: গাড়ি ভাড়া বাদ দিয়া হাজার বিশেক।

: ঠিক আছে, বাইরে গিয়া দাঁড়াও, আমি অনুমতির ব্যবস্থা করতেছি।

আব্দুল আজিজ বাইরে যায়। কিন্তু আর্তনাদ করে ওঠে উ মং।

: এইটা কি করলা ছোট ভাই। বিশ হাজারে তো তিনটা মুরগিই কিনতে পারবা।

: ফাও তিনটা মুরগি পাইলেই ক্ষতি কি?

: তোমার কথা তো কিছুই বুঝতেছি না।

: আজকে তো তেইশ তারিখ, পঁচিশ সেপ্টেম্বর আসুক, সব পানির মতো বুঝবেন। যান, অনুমতি দুইটা স্যারের সাইন করায়া দিয়া দেন। স্যার কিছু বললে আমার কথা বলবেন।

: তোমার কথার উপরে স্যার আর কি বলবেন। কাগজে-পত্রে অফিসের কর্তা স্যার হইলেও আসল কর্তা তো তুমিই। আব্দুল আজিজের ভেতরটা খুশিতে গাঁই মারছে। এতো সহজে অনুমতি দুটো পেয়ে যাবে তা ছিল তার কল্পনারও অতীত। খবরটা শুনে নাফিসা আর দাদাজানের কী প্রতিক্রিয়া হবে তাই মনে মনে কল্পনা করছে আব্দুল আজিজ। নাফিসার মুখটা লাজে রাঙ্গা সুবেহ সাদেকের আকাশ হয়ে যাবে। দাদাজানের ছানিপড়া নিস্প্রভ চোখে আশার আলো চিক্ চিক্ করে ওঠবে। কিন্তু হঠাৎ করে রোহিঙ্গাদের জন্যে এদের মনের কবাট খুলে গেলো কেন তাই তার মাথায় আসছে না।

হাঁটতে হাঁটতে রাচিডং বাসস্ট্যান্ডে কখন এসে পড়েছে নিজেই টের পায় না আব্দুল আজিজ। আতাউর চাচার গলার শব্দে সে বাস্তবতায় আসে– আব্দুল আজিজ, রাচিডং ক্যান আইছিলা পুয়া?

আতাউর ধনাঢ্য ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশ-ষাটের মাঝামাঝি। কাঁচা-পাকা দাড়িতে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন তার মধ্যে আলাদা এক আভিজাত্য এনে দিয়েছে। মংডু টু মাংগালা বাজার থেকে তার বিশটি বাস চলে। সেকেন্ড হ্যান্ড বাস হলেও, রোহিঙ্গাদের মধ্যে তিনি বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ। মাংগালা বাজারে তার পাইকারি দোকানও আছে। আব্দুল আজিজেরও একটা ছোটখাটা কনফেকশনারী আছে। সেই সুবাদেই তাদের ঘনিষ্ঠতা।

আব্দুল আজিজ সসম্মানে আতাউর রহমানকে সালাম দিয়ে থানা সদরে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে।

: তোমারে তো খুশি খুশি লাগতাছে? আমার আন্দাজ ভুল না হইলে বলতে পারি, তুমি অনুমতি পায়া গেছো।

: আলহামদুলিল্লাহ! আপনাদের দোয়ায় পায়া গেছি চাচা।

আতাউর রহমানের হিসাব মিলে না। একদিনে তোমার দাদার চোখের ছানি অপারেশনের আর তোমার শাদীর অনুমতি দিয়া দিলো? এইটাও কি সম্ভব? তোমারে দুই নম্বরী কাগজ দেয় নাই তো?

: আমিও তো কম তাজ্জব হই নাই। এই যে দেখেন, অফিসের সিল-ছাপ্পর মারা।

আতাউর রহমান অনুমতি পত্র দুইটা নিয়া পরখ করেন।

: আসল কগজই তো মনে হইতেছে। বুঝলা পুয়া, আমার মনে কয় হেরা আস্তে আস্তে বুঝতেছে যে, এইভাবে আমাদের কোণঠাসা করে রাইখ্যা তাদের ফয়দা নাই। বাকি দুনিয়ার সাথে তো তাল মিলাইতে হবে। শুনতেছি কফি আনান সাহেবের রিপোর্টে আমাদের নাগরিকত্ব দেয়ার সুপারিশ করছে।

বাসের জন্যে তারা অপেক্ষা করছে। দু'জনেই মাংগালা যাবে। মাংগালা টু মংডু রোডে যে বিশটা বাস চলাচল করে তার মালিক আতাউর রহমান। একটা প্রাইভেট কার সে ইচ্ছে করলেই কিনতে পারে, কিন্তু কিনে না। সরকারের রোষ দৃষ্টি তো আছেই, স্থানীয় মগ বৌদ্ধদের চোখেও তা একটা গর্হিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

তারা কথা বলে সময়টা পার করছে। এরই মধ্যে আর্মির একটা গাড়ি বহর মাংগালার দিকে ধেয়ে যেতে দেখে তারা। আব্দুল আজিজ গুনে দেখেছে, দশটা গাড়ি। প্রথমটা জিপ, বাকিগুলো সৈন্য ও সামানা ভর্তি কনভয়। কিছুটা আতংক নিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় তারা।

আতাউর রহমান বলেন– গ্রামের দিকে আর্মির গাড়ি যাইতেছে কেন পুয়া?

: কিছুই তো বুঝতেছি না চাচা। কোন গণ্ডগোলের খবরও তো পাই নাই।

: মনে তো হয় ক্যাম্প গাড়বো।

: সেই রকমের প্রস্তুতিই তো দেখলাম।

তাদের বুকের গহীনে এক অজানা আতংক হামাগুড়ি দেয়। আর্মি কোনদিনও তাদের জীবনে স্বস্তি নিয়ে আসে না। আর্মি মানেই হত্যা, বীভৎসতা, জান্তব বর্বরতা। ১৯৯১ সালে আর্মি আব্দুল আজিজ ও আতাউর রহমানের পিতা-মাতাকে গুলি করে মেরেছে। আতাউর রহমান বাড়িতে ছিল না, থাকলে তাকেই প্রথম গুলিটা করতো। ছয়

বছরের আব্দুল আজিজকে নিয়ে দাদাজান পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিল। সেখান থেকে বাংলাদেশে। সেসব কথা মনে করতে চায় না আব্দুল আজিজ। কিন্তু আর্মির গাড়ি বহর দেখে পুরনো ক্ষতটা টন টন করে ওঠে।

রমজান আলীর একটা চোখ গেছে, আরেকটা যায় যায় করছে। মংডু জেলা শহরে গিয়ে চোখের ছানিটা সরিয়ে দিলেই সে আগের মত সব দেখতে পারতো। আব্দুল আজিজ প্রয়োজনীয় খরচ যোগাড় করে রেখেছে। কিন্তু মংডু যাওয়ার অনুমতিটাই মিলছে না। হয়তো তারা ভাবছে, সত্তর বছরের বৃদ্ধ রমজান আলী এক ভয়ংকর সন্ত্রাসী, প্রায়-অন্ধ চোখেও সে মংডু শহরকে মুহূর্তেই লণ্ড ভণ্ড করে দিতে পারবে। তাই এই বিপজ্জনক বৃদ্ধকে কোনভাবেই এই গ্রামের বাইরে যেতে দেয়ার অনুমতি দেয়া যাবে না। এক বছর ধরে আব্দুল আজিজ রাচিডং থানা সদরে অনুমতির জন্যে ঘুরছে। কিন্তু অনুমতি মিলছে না। এর আগে আব্দুল আজিজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমতি লাভের জন্যে রমজান আলী দুইটা বছর মাটি কামড়ে কর্তাদের মন গলাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। ছেলেটা লেখাপড়ায় খুবই তুখোড় ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে রাখাইন রাজ্যে প্রথম দশ জনের মধ্যে ছিল। আব্দুল আজিজের পিতা-মাতার ইচ্ছে ছিল ছেলেটাকে অনেক বড় বিদ্বান বানাবে। বর্মি আর্মির দ্বারা নিহত আব্দুল আজিজের পিতা-মাতার এই ইচ্ছেটাকে বাস্তবে আনতে রমজান আলী চেষ্টার কোন কসুর করেনি। আব্দুল আজিজের মাথাও তাদের ইচ্ছেটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার পক্ষে ছিল সহায়ক। কিন্তু রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকের ইচ্ছেকে টুঁটি চেপে ধরে, তখন আর কি-ই বা করার থাকে। অবশ্য রোহিঙ্গাদের তারা রাষ্ট্রের নাগরিক মনে করে না। শত শত বছর ধরে যে মাটির বুকে তারা বেড়ে ওঠেছে, যে মাটির ধূলো গায়ে মেখে তাদের ভাষায় তারা মা ডাক শিখেছে, সে মাটি তাদের নয়। এই দেশ তাদের নয়। পৃথিবীতে এর চাইতে নিকৃষ্ট কোন মিথ্যা হতে পারে না। এই মিথ্যা বন্দুকের নল নিশানা করেই বলা সম্ভব। বন্দুক হাতে না থাকলে এইরকম মিথ্যা কোন সুস্থ মানুষ বলে সুস্থ থাকতে পারার কথা না। এই মিথ্যাটাকে প্রতিষ্ঠা করতে গত ষাট বছর ধরেই বন্দুকের তৎপরতা চালানো হচ্ছে। পাখির মতো মানুষ মারছে, পশুর মতো রোহিঙ্গা নারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

রমজান আলীর চোখ ভাল কাজ না করলেও তার মাথাটা এখনো দিব্যি কাজ করে। ফজরের আগেই ঘুম ভাঙ্গে রমজান আলীর। তিনটা সেমি পাকা ঘর নিয়ে তার বাড়ি। একশ' শতক জায়গার উপর বাড়িটাতে ঘর আছে তিনটি। একটাতে থাকে আব্দুল আজিজ। একটা নাফিসার, যদিও সেই ঘরটা তালাবদ্ধ থাকে। রমজান আলীর ঘরটাতে দুটো কামরা। তিনি যে কামরায় থাকেন তার পাশের কামরাটাতে থাকে নাফিসা। নাফিসার মুখটা এখন স্পষ্ট দেখতে পারে না রমজান আলী। চোখের আবছা দৃষ্টিতেও বুঝে, পুরুষের মাথা ঘুরে যাবার মতো সুন্দরী হয়েছে মেয়েটা। তার মাও ছিল সুন্দরী। বাবাও ছিল দশাসই চেহারার পুরুষ। বাবা-মায়ের গড়ন পেয়ে বিশ বছরের নাফিসা অনিন্দ্য সুন্দরী হয়ে ওঠবে এতো জানা কথাই। তবে রোহিঙ্গা মেয়েরা সুন্দরী হওয়াটা পরিবারের জন্যে কোন ভাল খবর না। ভয় ও আতংকের খবর। বৌদ্ধ মগরা খবর পেলে আর রক্ষা নেই। আর্মিদের মনোরঞ্জনের জন্যে প্রথম টার্গেট হয় এরা।

একসময় এই পুংনামছায়া গ্রামের সবাই ছিল মুসলমান। এখন অর্ধেকেরও কম। কয়েক দফায় মুসলমানদের মেরে ফেলা হয়েছে। অনেকেই বাংলাদেশে আছে শরণার্থী শিবিরে। আর রাখাইনের বাইরে থেকে মগদের এনে গ্রামটাতে সরকারি খরচে বসতি করে দেয়া হয়েছে কয়েক দফায়। উগ্রস্বভাবের এই মগরা বেশির ভাগই জেলখাটা দাগি আসামী। সাজা মওকুফের লোভ দেখিয়ে এদের সামরিক সরকার রাখাইনে বসতি করে দিয়েছে। এরা গণ্ডগোল করার জন্যে মুখিয়ে থাকে। পুলিশ ও আর্মির সাথে এরাও রোহিঙ্গা নিধনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। আর্মি-পুলিশের চর হিসাবেও এরা কাজ করে। কোন বাড়িতে সুন্দরি মেয়ে আছে, কোন বাড়ির রোহিঙ্গা ছেলেটি যুবক হচ্ছে, এরাই তা আর্মিকে জানায়। আর অ্যাকশনের সময় এরাও সমান তালে বর্বরতা চালায়।

রমজান আলীদের কেন এই দেশ থেকে তাড়াতে চায়, তার কোন কারণ চেষ্টা করেও খোঁজে পায় না রমজান আলী। তবে হ্যা, মুসলমান হওয়াটা যদি অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহলে সত্যই তারা অপরাধী। এটা তাদের সাত পুরুষের দেশ। সাত পুরুষ মানে শুধু সাত পুরুষ না, চৌদ্দ এমনকি একুশ পুরুষও হতে পারে। রাজা নরমিখলা যখন ইসলাম গ্রহণ করে রোসাং রাজ্য মানে আজকের রাখাইন শাসন করেন, তারাও অনেক আগে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আরব বণিকরা আকিয়াব বন্দরে ব্যবসা করতে আসতেন ইসলামের প্রাথমিক যুগেই। সুতরাং ইসলামের সাথে রাখাইনের সম্পর্ক হাজার বছরের। সেই সম্পর্কটা এখন আর্মি ও উগ্র বৌদ্ধরা বন্দুকের নলে ও জান্তব পাশবিকতায় ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায়। রোহিঙ্গাদের জোর করে বাঙ্গালী বানাতে চায়। কারণ রোহিঙ্গারা মুসলমান। রমজান আলী ভালো লেখাপড়া জানা লোক। ইতিহাস সে ভালই জানে। একটা সময় কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিল না। রাজা-বাদশারা কোন ভূখণ্ড জয় করে নিলেই সেটা তাদের রাজত্বের অন্তরর্ভুক্ত হতো। ১৭৮৪ সালের আগে রাখাইন তথা আরাকান তথা রোসাং রাজ্য প্রায় আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল।

এর পর থেকেই বার্মা থেকে হাজারগুণ সমৃদ্ধশালী আরাকানের কপালে দুর্দশার তিলক লাগতে থাকে।

আজকের চট্টগ্রামের সাথে একই শাসকের অধীনে কখনো কখনো আরাকান শাসিত হয়েছে। চট্টগ্রামের অনেক মানুষ যেমন বার্মায় বসতি স্থাপন করেছে, তেমনি বার্মা থেকেও অনেক উপজাতি ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বৃহত্তর চট্টলায় বসতি স্থাপন করেছে। চট্টগ্রামের চাকমা মুড়ং প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উপজাতি বার্মা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে। এদের ভাষা বাংলা না, ধর্মও ইসলাম না। কিন্তু বাংলাদেশি হতে তাদের কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মপ্রধান মিয়ানমারে কেন রোহিঙ্গাদের স্থান হবে না। তাছাড়া সারা বিশ্বের অনেক দেশেই মিয়ানমারের নাগরিকরা কাজ করছে, অভিবাসি হয়ে দ্বৈত নাগরিকত্ব লাভ করেছে। যে দেশের বর্বর সরকার শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে এই মাটির সাথে হাজার বছরের শিকড়সমৃদ্ধ রোহিঙ্গা জাতিকে নিজের মানুষ হিসাবে স্বীকার করে না, সেই বর্বর দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত নাগরিকরা কেন এই সুবিধা পাবে? রমজান আলী বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানদের উদ্দেশ্য করে একটা খোলা চিঠির ভাষা মনে মনে লিখতে থাকেন।

'বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ক্ষীণদৃষ্টির এক রোহিঙ্গা বৃদ্ধের খোলাচিঠি'

মহাত্মন, আমি একজন সত্তরোর্ধ রোহিঙ্গা বৃদ্ধ। রাষ্ট্রযন্ত্রের তলায় পিষ্ট হয়ে আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হচ্ছে। আমার জাতির ভবিষ্যতও আমারই মত। শত শত বছর আমি ও আমার পূর্বপুরুষরা এই মাটির ধূলো অঙ্গে মেখে বড় হয়েছি এবং এই জমিনের বুকের ভিতরে শেষ শয্যা নিয়েছেন। কিন্তু মা বা থা- কমিটি ফর প্রটেকশন অব ন্যাশনালিটি এন্ড রিলিজিয়ন এখন দাবি করছে, মিয়ানমার হলো বৌদ্ধদের দেশ। সামরিক বাহিনী ক্ষমতার মোহে মা বা থা'কে কোলে তুলে নাচাচ্ছে। মুসলমানদের আন্তর্জাতিক কোন কানেকশন না থাকাতে এবং রাখাইন সীমান্তবর্তী কোন দেশ থেকে কোন হুমকির আশংকা না থাকাতে মা বা থা তথা সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গা মুসলিম নির্মূলের কর্মসূচি গ্রহণ করে। জোর করে আমাদের এই দেশ থেকে বিতারণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের উপর বাঙ্গালীত্বের সিলমোহর মেরে আমাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে হত্যা গুম ধর্ষণের মধ্যে সন্ত্রস্ত করে এই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান:

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত বলছে না যে ভারত হিন্দুদের দেশ, ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ বলছে না যে বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া কেউই বলছে না এখানে মুসলমান ছাড়া কোন বৌদ্ধ থাকতে পারবে না। কিন্তু মিয়ানমার বলছে। একসময় বর্মিরা বলত বার্মা হলো বর্মিদের জন্যে। কিন্তু বর্মি জাতিগোষ্ঠি মিয়ানমারের মোট জনসংখ্যার শতকরা ষাট ভাগ। বর্মি ছাড়াও রোহিঙ্গাসহ আরো ১৩৬টি নৃগোষ্ঠি মিয়ানমারে বসবাস করে। এদের অনেকেই আবার বৌদ্ধ। সামরিক জান্তা হিসেব করে দেখেছে, বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৮ ভাগ। তাই এখন তারা ভোল পাল্টে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে টেনে, তাদের দিয়ে মা বা থা প্রতিষ্ঠা করে তাদের দ্বারাই এক উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলানো হচ্ছে মিয়ানমার হলো বৌদ্ধদের জন্যে। আর মুসলমানদের মিয়ানমারে থাকতে দেয়া হবে না। সুতরাং রোহিঙ্গা মুসলমানদের রাষ্ট্রহীন করার তৎপরতার পিছনে অবশ্যই উগ্র ধর্মীয় মতবাদ দায়ি। যদিও সামরিক জান্তার খেলার পুতুল বর্তমান সরকার এটিকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

মহামান্য সুবিবেচক:

শুধুমাত্র ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে পৃথিবীর কোন দেশ তার দেশের নাগরিকদের রাষ্ট্রহীন করে বিতারণের অপকৌশল গ্রহণ করেনি। এই হিসাবে মিয়ানমার দেশটিকে পৃথিবীর সবচাইতে বর্বর দেশ হিসাবে অনায়াসে আখ্যায়িত করা যায়। মিয়ানমারের অনেক নাগরিক পৃথিবীর অনেক দেশে কাজ করছে, কেউ কেউ নাগরিকত্বও লাভ করেছে। তাদের পাঠানো অর্থ রোহিঙ্গা নিধনে ব্যয় হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই এই বর্বরতার দায় তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না। হ্যা, যদি বিদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের নাগরিকগণ মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে আপনার দেশে থাকতে চান, তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু একই সাথে বর্বর দেশ মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তারা আপনার রাষ্ট্রে অবস্থান করবে তা মানবতার পক্ষে যায় না। তাই আমাদের প্রার্থনা, মিয়ানমারকে চাপে রাখার কৌশল হিসাবে বিদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের কর্মী ও অভিবাসীদের নিয়ে একটু ভাবুন। অসহায় রোহিঙ্গাদের পক্ষে মানবতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করুন। আপনার দেশের কর্মী ও অভিবাসীর প্রেরিত অর্থ যাতে রোহিঙ্গা নিধনে ব্যয় না হয়, সেই ব্যবস্থা করুন। ... ...

রমজান আলীর খোলা চিঠির খসড়া এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু নাফিসা বড়ই চঞ্চলা স্বভাবের। রমজান আলী আজ পর্যন্ত কোন চিন্তাকে শেষ ঘাটে নিতে পারেনি, তার আগেই সে হানা দিবে। আজও দিয়েছে। তার পাখির মতো গলায় খুশির ছটা ছিটকে বেরোচ্ছে। রমজান আলীকে তার আদরের নাতনীর কথা শুনতেই হয়। নাফিসা বলে– দাদাজান, ভাইজান আপনার সাথে কথা কইতে চায়।

: কিন্তু তোর এতো ফূর্তি লাগতেছে কেন? এখনো তো সে তোর ভাই-ই লাগে, জামাই তো হয় নাই।

: আপনি কি যে বলেন না, নেন, কথা কন।

: বুঝছি, খুশির খবর তোরে আগেই জানায়া ফেলছে, আমারে দিতে আসছোস বাসি খবর!

নাফিসার হাত থেকে মোবাইল নিয়ে রমজান আলী বলে– হ্যা, আব্দুল আজিজ, ক' কী খবর?

ও পাশ থেকে আব্দুল আজিজ বলে– আসসালামু আলাইকুম দাদাজান। খুশির খবর আছে?

: সেইটা তো বুঝতেই পারতেছি। কিন্তু খবরটা কী?

: আপনার চোখের ছানি অপারেশনের অনুমতি পাওয়া গেছে?

: আমার চোখ আদৌ ভাল আছে কি-না, সেইটাই তো জানি না। এইটাতে অতো খুশি হওয়ার কিছু নাই।

তোদের শাদির অনুমতি পাওয়ার যে পিটিশন করা ছিল, সেইটার কী হইলো?

: শাদীরও অনুমতি দিয়া দিছে?

: তাই নাকি? এইটা আসলেও খুশির খবর। নাফিসা, নাফিসা কই গেলি ...

নাফিসা আশেপাশে নাই। লজ্জায় সে দাদাজানের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ঘরে চলে গেছে।

বৃদ্ধ আবার বলে– হোন আব্দুল আজিজ, আসার সময় মিষ্টি নিয়া আসবি।

: এতো ব্যস্ত হওয়ার কিছু নাই দাদাজান। আগে মংডুতে নিয়া আপনার চোখ অপারেশন করি, পরে ...

রমজান আলী আব্দুল আজিজকে কথা শেষ করতে দেয় না। বলে– হোন, আমার উপরে মাতুব্বরি করতে আসবি না। আগে শাদী পরে অপারেশন। আমি কালকের পরের দিনই তোদের শাদী দিবো।

: দাদাজান, এইটা কি করে সম্ভব! আজ তেইশ তারিখ, কালকের দিন পরে হবে পঁচিশ তারিখ। পঁচিশ তারিখে কীভাবে শাদী হতে পারে?

: কেন, পঁচিশ তারিখে সমস্যা কী? এই দিনে শাদী না হওয়ার কোন কারণ আছে?

: না, তা নাই। কিন্তু কালকের দিন পরেই তো পঁচিশ তারিখ।

: সেইটা আমি বুঝবো। মোবাইল রেখে রমজান আলী আকাশের দিকে চোখ রাখে। আবছা একটা আলো পহাড়ের উপর দিয়ে তার চোখে

এসে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, আলো নয়, মনের একটা ধান্দা। মৃত দুই ছেলের মুখ দুইটি মনে করতে চেষ্টা করে সে। একজন নাফিসার বাবা, একজন আব্দুল আজিজের বাবা।

দুই

মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২৪ সেপ্টম্বর। দিনের আলো নিভে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু ফরেন মিনেষ্ট্রির স্পেশাল অফিসাররা বাসায় যাওয়ার কথা চিন্তাতেও আনতে পারছেন না। লাঞ্চের আগে দ্যা লেডির কেবিনে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছে। হোম মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার, আর্মি চীফ তো ছিলেনই, মা বা থা'র গেরুয়াধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু অশ্বিন ভিরাথুও ছিলেন। মিস্টার উইন জয়েন্ট সেক্রেটারি লেবেলের অফিসার হলেও এইসব মহারথীদের তুলনায় নস্যি। সঙ্গত কারণেই সভার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার জানার প্রশ্নই উঠে না। তবে অজানাও কিছু থাকবে না। বিভিন্ন দেশের ফরেন মিনেষ্ট্রির গোপনীয় বার্তা আদান-প্রদানের দায়িত্বে তিনি আছেন। যেহেতু দ্যা লেডি ফরেন মিনিষ্ট্রি দেখেন, তাই মিটিং-এর সাবজেক্টে ফরেন কানেকশন থাকবেই।

রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হওয়ার একটু পরেই হাই হিলে কংক্রিট কাঁপিয়ে শিন আসে। স্কিনটাইট জিন্সের সাথে ইন করা সাদা শার্টে ত্রিশ বছরের যৌবন উৎকটভাবে ফুটে ওঠেছে। দ্যা লেডির এপিএস প্রেস। মিস্টার উইনের দুই ধাপ নিচের পোষ্টে থেকেও অনেক সময় তাকে ডোমেনেইট করার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে এডাল্ট জোকও বলে। মিস্টার উইনের মোহ টগবগিয়ে উঠলেও নিজেকে কষ্ট করে শাসনে রাখেন। কেউ বলেনি, কিন্তু অফিসার পাড়ার গোপন খবর হলো মিসেস শিন আর্মি চীফের বেড পার্টনার।

মিসেস শিন ঝুঁকে মিস্টার উইনের স্পর্শের কাছাকাছি এনে মনিটরে চোখ রেখে বলে– গুড আফটার নুন স্যার। বুঝতেই পারছেন, সামথিং সিরিয়াস...

মিস্টার উইন মিসেস শিনের স্পর্শ বাঁচিয়ে শরীরটাকে চেয়ারের এক পাশে নিয়ে আসে। এই অবস্থায় কেউ দেখে ফেললে এবং আর্মি চিফের কানে খবরটা গেলে তার খবর আছে। গোখরো সাপ দেখতে সুন্দর, কিন্তু তার ছোবল ভয়ংকর।

মিস্টার উইন বলেন– তাতো অবশ্যই। রাষ্ট্রের গু রুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা শুধুমাত্র কফি খেতে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেননি নিশ্চয়।

: আই থিংক, রোহিঙ্গাদের বিষয়ে কোন ডিসিসন আসতে পারে।

: মাইন্ড ইউর ল্যাংগুয়েজ মিসেস শিন। রোহিঙ্গা শব্দটা কিন্তু অফিসিয়াললি নিষিদ্ধ।

: সরি স্যার, তবে আমরা তো আর অফিসিয়াল কোন কথা বলছি না। ওকে, আমার মনে হয় রাখাইনের মুসলমান, অফিসিয়াললি যাদের স্ট্যাটাস অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালী, তাদের ব্যাপারে একটা স্ট্রং ডিসিসন নিতে যাচ্ছে সরকার।

: আমি জানি না। তবে আজ হোক কাল হোক, সরকার একটা স্টেপ নিবে সে তো জানা কথাই। গত ষাট বছর ধরে ওদেরকে রাখাইন থেকে বিতাড়িত করতে রাষ্ট্র তো কম চেষ্টা করছে না। ওদের রাষ্ট্রীয় আইডেনটিটি মুছে ফেলার সব ধাপই তো সম্পন্ন হয়েছে।

: স্যার, আপনি কি ওদের প্রতি সিমপেথ্যাইজড্?

আঁৎকে ওঠে মিস্টার উইন। এমন কথা উপরের মহলে গেলে চাকরি তো থাকবেই না, গুম হবারও সম্ভাবনা আছে। মিস্টার উইন দোষমুক্ত হওয়ার জন্যে বলেন– আমি বোঝাতে চাচ্ছি একটা স্ট্রং স্টেপ নেয়ার এখনই সময়। গত ষাট বছর ধরে রাষ্ট্র এদের জন্যে অনেক মেধা খরচ করেছে। আর এখনই ফসল ঘরে তোলার মোক্ষম সময়।

: ভাল বলেছেন স্যার। একজন জেনুইন আমলার মতো কথা বলেছেন।

মিসেস শিনের কটাক্ষপূর্ণ হাসিতেও মিস্টার উইনের ভেতরের ছটফটানি কাটেনি। আর যে মেয়ে স্বামী-সন্তান রেখেও আর্মি চীফের বগলদাবা হতে পারে, তাকে বিশ্বাস করাটা কঠিন। স্টেট কাউন্সিলরের গতিবিধি এবং এখানকার অফিসারদের মতিগতি জানার জন্যেই আর্মি চীফ তাকে এখানে বসিয়েছেন। প্রত্যেক সান-ডে'তে নেপিতোর একটা ফাইভ স্টার হোটেলে আর্মি চীফের সাথে মিসেস শিন সময় কাটায়। আর্মি চীফের পরনারী আসক্তির কথা ওপেন সিক্রেট। তাই এ নিয়ে কেউ আর কোন ফিসফিসানি করে না। ফিসফিসানি যা আছে তা হলো মিসেস শিনের রিপোর্ট নিয়ে। মিসেস শিনের অলিখিত রিপোর্টের উপর জীবন ও চাকরির সিঁড়ির অধোগতি-উর্ধ্বগতি নির্ভর করে। মিস্টার উইনকে তাই মিসেস শিনের আস্থাভাজন হতে কসরত করতে হয়। শব্দ চয়নেও এবার বেশ সতর্ক থাকেন মিস্টার উইন।

: শোন মিসেস শিন, রাখাইনের মুসলমান, আই মীন বাঙ্গালী মুসলমানদের অনেক কথাই তোমাদের জেনেরেশন কিন্তু জানে না। এরা ঐতিহাসিকভাবেই মিয়ানমারের মূলস্রোতের সাথে যায় না। ১৯৬২ সালে জেনারেলরা একমত হোন যে, রাখাইন রাজ্যের সংহতির প্রয়োজনেই এদেরকে বাস্তচ্যুত করা অপরিহার্য।

: এসব আমি জানি স্যার। ওয়ার্ল্ডের ফেমাস সব নিউজপেপার আমাকে পড়তে হয়। আমাদের কোন নিউজপেপারে এসব না থাকলেও বিশ্বের অনেক কাগজে এদের নিয়ে লেখালেখি হয়েছে।

: নো মাই ডিয়ার, তুমি সব কিছু জানো না। পেপারে সেটুকুই আসে, যতটুকু প্রোভ করা যায়। কিন্তু একটা ঘটনার পিছনে অনেক অনুঘটক থাকে। পুকুরে ঢিল পড়াটা দেখা যায়, কিন্তু ঢিলটা কে এবং কেন মেরেছে সেটা জানতে হলে তোমাকে শুধু পুকুরের দিকে চোখ রাখলেই চলবে না।

মিসেস শিন একটু ভাবে। তাকে মানুষ চরিয়ে খেতে হয়। মানুষের সাইকোলজি বুঝতে পারার একটা স্পেশাল পাওয়ার তার আছে। আর্মি চীফ এমনটা মনে করে বলেই তাকে এতোটা ভরসা করেন। সেও চীফকে কখনো হতাশ করেনি। করেনি বলেই তার পেটি অফিসারের ক্ষমতার কাছে এইসব বিগ বিগ অফিসারও মাথা তোলার সাহস করতে পারে না। দ্যা লেডি অবশ্য তাকে পছন্দ করেন না। অবশ্য তার পছন্দ-অপছন্দতে মিসেস শিনের খুব একটা যায়-আসেও না। আর্মি চীফের রিকোমেন্ডশনে সে এই জায়গায় এসেছে। তাকে সরাতে হলে আর্মি চীফের সম্মতি নিয়েই সরাতে হবে। মিস্টার উইনের মধ্যে সে আর্মি চীফের অপছন্দ করার মতো কিছু এখনো পায়নি। আর আর্মি চীফ শুধু নিজের ক্ষমতা সংহত করার কথা ভাবেননি। পুরো বাহিনী এবং ইউ এস ডি পি ইউনিয়ন সলিডারিটি এন্ড ডেভেলপম্যান্ট পার্টির কথাও সমান তালে ভাবেন। ভাবেন বলেই তাকে তার গোষ্ঠির সবাই

মানে। তার চিন্তাকে বাস্তবায়ন করার জন্যে হাজারও মানুষ কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য দুর্মূখেরা মনে করে ক্ষমতা ও স্বার্থের মোহেই তারা তার সাথে গলা মিলাচ্ছে। মিসেস শিন জানে, কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সে নিজেই। আর এতে সে কোন দোষও দেখে না। মানুষ বেঁচে থাকে ক্ষমতা আর স্বার্থের মোহেই। জীবন একটাই। এই এক জীবনে ক্ষমতার আশেপাশে নিজেকে না নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে থাকার কোন মজা থাকে না। কেউ কেউ অবশ্য আদর্শ-নৈতিকতার বাণী কপচায়। মিসেস শিন জানে, এরা সব ফালতু লোক। এরা সেই ধূর্ত শিয়ালের মতো, যে বলে বেড়ায় আঙ্গুর ফল টক।

মিসেস শিনকে ভাবতে দেখে মিস্টার উইনও ভাবনায় পড়েন। মেয়েটার মনের ভাব বুঝা খুবই দুষ্কর। অবশ্য এইসব মেয়েদের মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে যাওয়াটাই বোকামি। এরা ছলনার একটা আস্তরণ লাগিয়ে নিজেকে আড়াল করার কায়দা জানে। আর এটাই এদের আসল যোগ্যতা। কিন্তু মিস্টার উইনও কম ঘাগু লোক না। ক্ষমতার বেশ কয়টি সিঁড়ি তিনি ছাগু খেয়ে ভাঙ্গেননি। বুদ্ধি খাটিয়ে ভাঙ্গিয়েছেন।

মিস্টার উইন বলেন– মিসেস শিন, তোমার হয়তো আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড জানা নেই। আমার ফাদার হোম মিনেস্ট্রির সেক্রেটারি হিসাবে রিটায়ার্ড করেছেন। রাখাইনের মুসলমানদের আজকের অবস্থায় নিয়ে আসার পিছনে তাঁর অনেক অবদান আছে।

: তাই নাকি? কিন্তু আগে তো কোনদিন এসব কথা বলেননি?

: বলার প্রয়োজন হয়নি তাই বলেনি। ১৯৮৭ সালে তিনি রিটায়ার্ড করেন।

: উনি কী করেছেন আপনি বলতে পারবেন?

: দেখো, এসব কথা তো আর অফিসের ফাইলে থাকে না। কিন্তু আমার স্মৃতির ফাইলে একটা ঘটনা এখনো জ্বল জ্বল করে লেখা আছে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। ১৯৭৮-এর আগের ঘটনা। আমাদের বাসার ড্রয়িংরুমে একজন আর্মির কর্নেলের সাথে তিনি কথা বলছেন। আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছিলাম।

কর্নেল : আপনাদের সিভিলিয়ানদের এই হলো সমস্যা। আরে বাবা, এ তো এনালাইসিস করার কী আছে! ডান্ডা মেরে এদের সরিয়ে দিলেই তো হলো।

বাবা : সরি কর্নেল সাহেব, আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। ডান্ডা মারেন তাতে সমস্যা নাই, কিন্তু কোন নির্দোষ লোককে আপনি ডান্ডা মারতে পারেন না।

কর্নেল : এরা মুসলমান, এটাই কি এদের ডান্ডা মারার জন্যে যথেষ্ট না? এদের চিন্তা-চেতনা আমাদের সাথে যায় না। আমাদের মানুষের সাথে এরা মিশতে পারে না, এটাই যথেষ্ট কারণ।

বাবা : না, ডান্ডা মারার এটা কোন কারণই হতে পারে না। আর এই কারণে ডান্ডা মারতে গেলে উল্টো আমরাই সমস্যায় পড়ে যাবো।

কর্নেল : মিস্টার সেক্রেটারি, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার চিন্তাধারা আমাদের সাথে খাপ খাচ্ছে না। আপনি জান্তা সরকারের একজন সিনিয়র অফিসার হয়ে রাখাইনের মুসলমানদের পক্ষে কথা বলছেন, এটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক।

বাবা : আমার কথা পুরোটা শুনে পরে মন্তব্য করলে আমার প্রতি সুবিচার করা হবে।

কর্নেল : ওকে, বলুন, আপনি কি বলতে চান?

বাবা : ওরা মুসলমান, এজন্যেই এদের রাখাইন থেকে বিতাড়িত করতে হবে– এটা হলো প্রকৃত সত্য। কিন্তু এই কাজটা করতে গেলে সারা বিশ্বের মুসলমানরা ক্ষেপে যাবে। এখানে যেমন মুসলমানরা সংখ্যালঘু, তেমনই অনেক মুসলিম দেশে লাখ লাখ বৌদ্ধ আছে, যারা সংখ্যালঘু। তো আপনি যদি মুসলমান হওয়ার কারণেই এদের বিতাড়িত করতে চান, তাহলে মুসলিম দেশের বৌদ্ধরাও সমস্যায় পড়বে।

কর্নেল : আপনার এই কথাটায় যুক্তি আছে। তা হলে আপনি কি এদের এদেশে থাকতে দিতে চান?

বাবা : না, চাই না। এরা স্বাধীনচেতা, নিজস্ব ঐতিহ্যকে কোনভাবেই মিয়ানমারের জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে একাকার করবে না। এদের জন্মহার বেশি। মুসলিমরা বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত না হলেও অনেক বৌদ্ধ মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। বিশেষ করে অনেক বৌদ্ধ যুবতি অলস মাতাল বৌদ্ধ পুরুষদের তুলনায় রোহিঙ্গা মুসলিম পুরুষদের পছন্দ করে তাদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। যদিও আমরা মগদের রাখাইনে সরকারি সুবিধা দিয়ে অভিবাসন করছি এবং রোহিঙ্গাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নির্যাতনের মধ্যে রেখে তাদের সংখ্যালঘুত্ব ধরে রাখার চেষ্টা করছি– কিন্তু চাপ না থাকলে এরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রাখাইনের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠি হিসাবে আভির্ভূত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

কর্নেল : এবং রাখাইনকে অতীত ইতিহাসের জায়গায় নিয়ে যেতে চাইবে। আই মীন মুসলিম রাখাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে এরা দেখতে চাইবে এবং মিয়ানমার থেকে আলাদা হতে চাইবে।

বাবা : আপনার আশংকাকে আমি সাপোর্ট করছি মিস্টার কর্নেল।

কর্নেল : একজন সিভিলিয়ানের সাথে আমাদের পার্থক্য এখানেই। আপনিও এদেরকে আপদ মনে করেন কিন্তু ডান্ডা মেরে তাড়িয়ে দেওয়াটাকে সাপোর্ট করেন না। শোনেন, এনিমি মাস্ট বি ডেসস্ট্রয়। শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, এটাই আামদের মূলনীতি।

বাবা : শত্রুকে ধ্বংস অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু...

কর্নেল : নো মিস্টার সেক্রেটারি, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু আমরা বরদাস্ত করবো না।

বাবা : দেশটা আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের ইচ্ছাই এখানে সার্বভৌম। তবে আমাদের ওপিনিয়নটা শুনে রাখলে তো ক্ষতি নেই। হয়তো ভাল কোন রেজাল্ট আসতেও পারে।

কর্নেল : ওকে, আপনার সাজেশন কী বলুন শুনি।

বাবা : আমরা সিভিলিয়ানরা মনে করি, কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে চাইলে তার মাথায় দোষীর সিলমোহর মেরে দাও। দোষীর সিলমোহর থাকলে আমার পক্ষের লোকদের আমাকে সমর্থন করার একটা নৈতিক

১১২ বছরের ঐতিহ্যে লালিত কোটি কোটি মানুষের
আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক হামদর্দ

হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসুন
হলিস্টিক চিকিৎসা গ্রহণ করুন

ব্যবস্থাপত্রের জন্য কোন
ফি নেয়া হয় না

জনগণের দোরগোড়ায়
স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে
দেশব্যাপী রয়েছে
হামদর্দ-এর
চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র

- বাংলাদেশ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক GMP সনদপ্রাপ্ত।
- ISO সনদপ্রাপ্ত।
- প্রতিটি চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্রে রয়েছে অভিজ্ঞ উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা চিকিৎসক।
- শুক্রবারসহ প্রতিদিনই সকাল ৯.০০টা হতে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত অত্যন্ত যত্ন সহকারে রোগী দেখা হয়।
- বাংলাদেশ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদনকৃত হামদর্দের নিজস্ব গবেষণালব্ধ প্রতিটি ওষুধ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে GMP মান অনুসরণ করে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট, কেমিস্ট, হাকীম, কবিরাজ, মাইক্রোবায়োলজিস্ট ও বোটানিস্ট-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়।

হামদর্দের আয়ের সমুদয় অর্থ শিক্ষা, চিকিৎসা ও
আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করা হয়

হামদর্দ

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ
১৯০৬ সাল হতে মানব সেবায় নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান
হামদর্দ ভবন, ৯৮-৯৯, বীর উত্তম সি আর দত্ত সড়ক, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ৯৬৩২৩৫১, ৯৬৩২৩৫২, ৯৬৩২৩৫৩
৯৬৬৫৯৬৫-৬৬, ৯৬৭১৬৬৫, ৯৬৭২৩১২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৩২৩৫৪, ৮৮-০২-৯৬৬৯৮২৩
ই-মেইল : info@hamdard.com.bd
ওয়েব : www.hamdard.com.bd

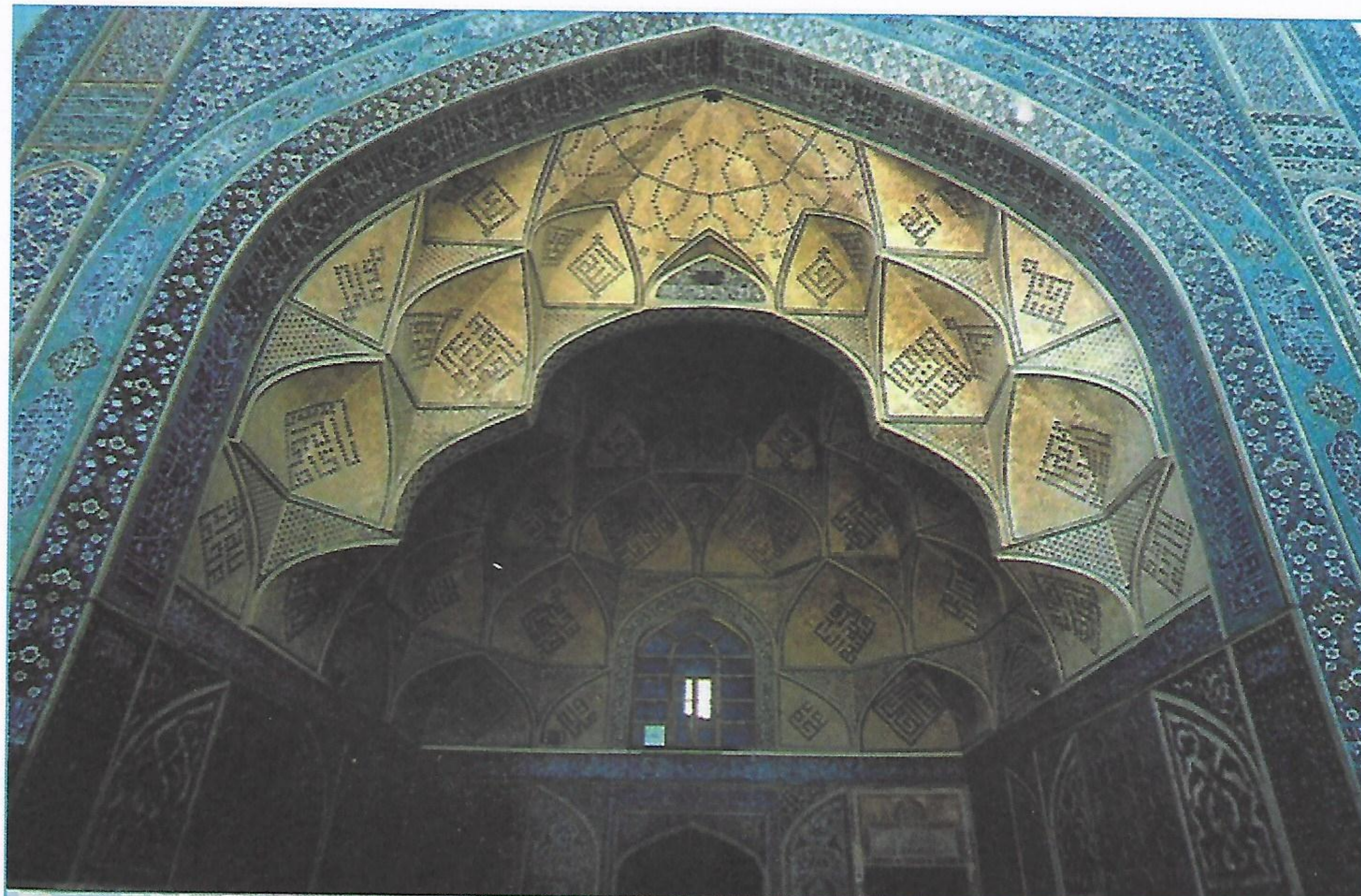

Opening a new horizon in islamic finance

Deposit Products

- Mudaraba Term Deposit (MTD)
- Mudaraba Term Deposit (Monthly Profit Paying)
- Mudaraba Double/Triple Benefit Scheme
- Mudaraba Pension Deposit Scheme (DPS)
- Mudaraba House Owning Deposit Scheme
- Mudaraba Hajj Deposit Scheme
- Mudaraba Lakhopoti/Kotipoti Deposit Scheme
- Mudaraba Marriage Saving Scheme
- Mudaraba Mohor Deposit Scheme
- Mudaraba Education Saving Scheme
- Mudaraba Cash Waqf Deposit Scheme
- Mudaraba Special Deposit Scheme
- Mudaraba Millionaire Deposit Scheme

Investment Products

- Lease Finance
- Hire Purchase Shirkatul Melk- Real Estate Financing
- Hire Purchase Shirkatul Melk-General
- Bai-Muajjal Financing (BAIM)
- SME Finance
- Project Finance

IFIL
Your Partner in Business

ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
Islamic Finance and Investment Limited
Based on Islamic Shariah, the first of its kind in Bangladesh

Head Office: Bhuiya Center, 68 Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh, Ph: 880-2-47118483, 01766 665757, Fax: 880-2-956 3566, Email: info@ifilbd.com

Principal Branch : 01713 012682
Chittagong Branch: 01711 725967
Bogra Branch : 01714 081092
Narayanganj Branch: 01713 118741
Uttara Branch : 01766 665860
Nayabazar Branch : 01766 665846

web: www.ifilbd.com

Gungchil / IFIL

অবলম্বন তৈরি হয়। প্রত্যেক ধর্মের লোককে রাষ্ট্র সমান সুযোগ-সুবিধা দিবে, ধর্মীয় পরিচয়ের জন্যে রাষ্ট্র তাদের নির্যাতন করতে পারবে না, এটা হলো আধুনিক বিশ্বের সার্বজনীন ধারণা। তো রোহিঙ্গারা মুসলিম, এই অপরাধে তাদের এই রাষ্ট্র থেকে বের করে দিতে চাইলে সারাবিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আমাদের বন্ধুরাও চক্ষুলজ্জার খাতিরেও আমাদের সমর্থন করবে না।

কর্নেল : মিস্টার সেক্রেটারি, আমি কিন্তু এবার সত্যি সত্যি বিরক্ত হচ্ছি। আপনি ইনিয়ে-বিনিয়ে এদের পক্ষেই সাফাই গাইছেন। আপনি বলতে চাইছেন এদের তাড়িয়ে দিলে আমরা সমস্যায় পড়বো, সুতরাং এরা এখানে থেকে বংশবৃদ্ধি ও ধর্মান্তরিত করে ফুলে-ফেঁপে উঠুক।

বাবা : প্লিজ কর্নেল সাহেব, দয়া করে মাথা ঠাণ্ডা করে আমাকে শেষ করতে দেন। আমি কিন্তু একবারও বলছি না এরা এখানে থাকুক। এরা যে মিয়ানমারের সংহতি ও নিরাপত্তার জন্যেহ্ ককি, সেটা আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এরা মিয়ানমারের নাগরিক।

কর্নেল : তো। নাগরিক তো কী হয়েছে?

বাবা : রাষ্ট্রের নাগরিককে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিবে, সকল সুযোগ-সুবিধা দিবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি এদেরকে নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তাদের উপর নির্যাতন করবেন, সেটা তো কেউ মানবে না।

কর্নেল : আমরা কারো মানামানির ধার ধারি না।

বাবা : এটা কিন্তু সুস্থ কোন সমাধান না।

কর্নেল : (চিৎকার) তো সমাধানটা বলেন দয়া করে।

বাবা : আপনি এদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলতে পারেন। এরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলে, দেখতেও এরা বাঙ্গালীর মতো। আপনি বলতে পারেন এরা বাঙ্গালী, এরা এ দেশের লোক না। মিডিয়াকে যদি কন্ট্রোল করতে পারেন, তাহলে দেশের বাইরে তেমন একটা প্রচার হবে না। আর যেহেতু খুন-খারাবি জ্বালাও-পোড়াও হচ্ছে না, বাইরের বিশ্বও এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তবে বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত করতে এদের নাগরিকত্ব আপনি কেড়ে নিতে পারেন।

কর্নেল : কী ভয়ংকর কথা বলছেন আপনি! এও কি সম্ভব! এরা তো শত শত বছর ধরে রাখাইনে বসবাস করছে। আপনি কি করে বলবেন যে এরা আমার দেশের নাগরিক না?

বাবা : খুবই সম্ভব। কারণ আপনার হাতে তো বন্দুক আছে। ধাপে ধাপে এই কাজটা করতে হবে। কয়েক বছর সময় লাগবে।

কর্নেল : এখানেই তো সমস্যা। আপনারা সিভিলিয়ানরা শুধু শুধু সময়ক্ষেপণ করতে চান।

বাবা : আমি আমার কথা বললাম। যদি পারেন আমার কথাটা হাই কমান্ডে কেরি করবেন।

স্মৃতিচারণ শেষ করে মিস্টার উইন মিসেস শিনের দিকে তাকান। মিসেস শিন তন্ময় হয়ে শুনছিলো আর মনে মনে মিস্টার উইনকে আর্মি চিফের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। গত সপ্তাহে মিস্টার শিনকে জড়িয়ে ধরে মদিরায় চুমুক দিতে দিতে আর্মি চিফ বিভিন্ন পেশার চার-পাঁচ জনকে নিয়ে একটা পকেট-গ্রুফ তৈরি করার কথা বলেছিলেন। এই গ্রুপের সদস্য হবে মা বা থা'র দ্বিতীয় সারির একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, আর্মির একজন কর্নেল, সুশীল সমাজের কোন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এবং সরকারের একজন দ্বিতীয় সারির আমলা। মিসেস শিন আর্মি চিফ ও এই পকেট কমিটির মধ্যে যোগসূত্র হয়ে কাজ করবে। পঁচিশ তারিখের ডিজেস্টারের পরের ঘটনাপ্রবাহ সারাবিশ্ব কীভাবে দেখে তার প্রতি এই গ্রুপ সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং সরকার কিভাবে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করবে তার খসড়া তৈরি করে আর্মি চিফকে দিবে। বলাবাহুল্য, এই গ্রুপ সেনাবাহিনীর স্বার্থকে সামনে রেখেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। রোহিঙ্গা মুসলিমদের যাতে চিরতরে রাখাইন থেকে বিতাড়িত করা যায় তার জন্যে শঠতা, প্রতারণা, মিথ্যাচার যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা যাবে। দ্যা লেডি কী বলবেন তাও এই গ্রুপ ঠিক করে দিবে। এদের বিশ্বস্ততা হবে প্রশ্নাতীত। কর্নেল আর মা বা থা'র ভিক্ষুর বিশ্বস্ততার বিষয়ে আর্মি চিফের কোন সন্দেহ নাই। তবে মাঝারি সারির আমলা আর সুশীলকে নিয়ে তিনি নিঃসন্দেহ নন। এজন্যেই মিসেস শিনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন মাঝারি মাপের আমলার নাম প্রস্তাব করতে, যাকে সে চোখে চোখে রাখতে পারে। মিসেস শিন মিস্টার উইনের নাম প্রস্তাব করবে বলে মনে মনে ঠিক করে নেয়। কিন্তু এখনই কিছু বলবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। আর একটু পরখ করার উদ্দেশ্যে বলে–

: পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে যে, কর্নেল সাহেব আপনার ফাদারের আইডিয়া হাই কমান্ডে প্লেস করেছিলেন এবং সেই মতোই তৎপরতা চালানো হয়েছিলো।

: না, ঠিক সেই সময় বাবার প্রপোজাল ধরে অ্যাকশন নেয়া হয়নি। আর ফৌজি ব্যাপার-স্যাপার, একজন কর্নেলের পক্ষে একজন জেনারেলকে ঠুসঠাস করে স্যালুট দেয়া যতটা সহজ, তার সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী ওপিনিয়ন দেয়া ততটাই কঠিন।

: কিন্তু ওদের নাগরিকত্ব তো বাতিল করা হয়েছে।

: হ্যা, হয়েছে। কিন্তু বাবা যখন বলেছেন তখন না। ঐ সময় বাবার কথা মেনে নেয়া হলে আমরা আজকের সময় থেকে আরও পাঁচ বছর এগিয়ে থাকতাম। এই সময় বসে আমরা রোহিঙ্গা, আই মিন রাখাইনের বাঙ্গালী মুসলিমদের নিয়ে ভাবতাম না, মুসলিম শূন্য রাখাইনের উন্নতি নিয়ে ভাবতাম।

: তো সেই সময় কী হয়েছিলো?

: সেই সময় জান্তা সরকার যথেষ্ট হোমওয়ার্ক না করেই ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গা, আই মিন রাখাইনের বাঙ্গালী মুসলিমদের উপর স্টিমরোলার চালনা শুরু করে দেয়। তিন লাখ রোহিঙ্গা নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। জিয়াউর রহমান তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। বহির্বিশ্ব, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তখন বেশ ভালো। জিয়াউর রহমান জান্তা সরকারকে চাপ দেয় রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু জান্তা সরকার আজকের মতো গড়িমসি করতে থাকে। জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনী থেকে আসলেও দেশের কথাই আগে ভাবতেন। তিনি হুংকার দিলেন, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়া না হলে

তিনি তাদের ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্রসহ রাখাইনে পাঠাবেন। অনেকটা বাধ্য হয়েই জান্তা সরকার বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া তিন লাখ রোহিঙ্গাকে ফেরত আনে।

: এই ঘটনা তো আমরা সবাই জানি।

: কিন্তু ভেতরের কথাটা জানো না। জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলো, অনেকটা অপমানিত হয়েই তাদের কাজটা করতে হয়েছিল। ফেরত আনার পরে তারা বুঝল যে এটা ছিল হঠকারিতা। শুধুমাত্র বল প্রয়োগ করেই একটি জাতিকে রাখাইন থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব না। এর জন্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সঠিক সময়কে কাজে লাগাতে হবে। সেই কর্নেল তখন হাই কমান্ডে বাবার আইডিয়াটা কেরি করলো। জেনারেলরা বাবাকে ডাকলেন এবং বাবার আইডিয়াটা গ্রহণ করলেন। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হলেন। সাত্তার সাহেব রাষ্ট্রপতি হলেন এবং কিছুদিন পরেই জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করলেন। বাংলাদেশে ক্ষমতা পালাবদলের এই অস্থিরতার সময়টা জান্তা সরকার বেছে নিলেন। ১৯৮২ সালে জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিলেন। তারা হয়ে গেলো বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকারী। আস্তে আস্তে তাদের সমস্ত নাগরিক সুবিধা বন্দুকের নলের তৎপরতায় বাতিল করা হতে লাগলো। তারা সরকারি চাকরি করার বৈধতা তো হারালোই, এমনকি শিক্ষার অধিকারও হারালো। এমনকি গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত করা হলো। নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হলে তাদের অনুমতি নিতে হতো। বিবাহ, চিকিৎসা ভ্রমণ সবকিছুই নজরদারিতে আনা হলো, যা একজন অনুপ্রবেশকারীর বেলায় করা হয়। এই সময়ে আমাদের তৎপরতা যদি বাংলাদেশ নজরদারিতে রাখতো, তাহলে আমাদের অনেক সমস্যা পোহাতে হতো। মজার ব্যাপার হলো এরশাদ সাহেব নিজের ক্ষমতা সংহত করতে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আমাদের তৎপরতার দিকে দৃষ্টি দেয়ার তার কোন ফুসরতই ছিল না। ১৯৭৮ সালের পরে আমরা খুবই পরিকল্পনার সাথে এগুচ্ছি।

: আপনি সঠিক কথা বলেছেন। আর এখন তো এই বিষয়টা নিয়ে জনগণও আমাদের সাথে। তারা রাখাইনের মুসলমানদেকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবেই দেখে।

: এমনি এমনি দেখে না। এর জন্যে কসরত করতে হয়েছে। প্রথম প্রথম দ্যা লেডি অবশ্য চাইতেন না। কিন্তু এখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই তাকেও জনগণের ইচ্ছার সাথে তাল মিলাতে হচ্ছে।

গলা খাটো করে মিসেস শিন বলে– আমি তো আবার অন্য কথা শুনেছি?

: দ্যা লেডি ইয়াং বয়সে পাকিস্তানি এক মুসলিম যুবকের সাথে প্রেমে পড়ার কথাই তো বলছো?

: হ্যা, তাই বলছি। তবে তার সাথে একটু এড করতে চাইছি। শুনেছি সেই মুসলিম যুবকের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকেই তিনি মুসলিমবিদ্বেষী হয়ে গেছেন।

: হতে পারে। কিন্তু তিনি কি হয়েছেন বা কি চাইছেন– সেইটা কোন ফ্যাক্ট না। এখন সামরিক বাহিনীর সহযোগি হিসাবে মা বা থা আছে। আর মা বা থা উগ্র বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার কথা প্রচার করলেও জনগণ তাদের কথা গিলেছে এবং গিলছে। আমার মনে হয় মিয়ানমারের ফিউচার পলিটিক্সে দ্যা লেডি একজন ডেড হর্স ছাড়া আর কিছুই নন।

: সেটা তিনি বুঝতে পারছেন, আর পারছেন বলেই সামরিক বাহিনীর সাথে তাল দিয়ে তাকে টিকে থাকতে হচ্ছে।

: খুবই পেইনফুল, তাই না মিসেস শিন। যে নেত্রীর মুখের একটা কথায় হাজার হাজার মানুষ জীবন দিতে পারতো, আর এখন সেই নেত্রীকেই অন্যের শিখিয়ে দেয়া কথা বলে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে হয়।

মিসেস শিন একটা কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই দ্যা লেডির ঘরের সামনের লাইট জ্বলে ওঠে। মিসেস শিনকে তলব করা হয়েছে। হয়তো কোন নোট লিখতে হবে। মিসেস শিন হাই হিলে খট্ খট্ আওয়াজ তুলে যেতে যেতে বলে– আপনার জন্যে একটা গুড নিউজ আছে স্যার।

মিসেস শিনের মুখ থেকে গুড নিউজের কথাটা শোনার পরে মিস্টার উইনের ভেতরটা বেশ পুলকিত হয়। উপরের অনেক খবরই রাখে মেয়েটা। নিশ্চয়ই তাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানো হবে। তবে মিনিট পনের পর থেকেই বার্তা আদান-প্রদানের কাজে এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, গুড নিউজের রহস্য উদঘাটন করার কোন ফুসরতই করতে পারেননি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু মিস্টার উইন চেয়ার ছাড়তে পারছেন না। রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরেই কয়েকটি দেশে তাকে বার্তা পাঠাতে হয়। বার্তায় বলা হয়, গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার জানতে পেরেছে যে, আরাকান সলিডারিটি আর্মি–আরসা নামে মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন রাখাইনের মুসলিমদের সহযোগিতায় সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করছে। বাধ্য হয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসাবে সরকার আরসা ও তাদের সহযোগি রাখাইনের মুসলিমদের উপর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। বলাবাহুল্য সামরিক বাহিনীর এই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকেও মুসলিম মৌলবাদি রাষ্ট্র এবং মিয়ানমার যাদের অঙ্গুলি হেলনে সাড়া দেয় না– সেই সব শক্তিশালী রাষ্ট্র মানবতার দোহাই দিয়ে মিয়ানমারকে কোণঠাসা করার অপপ্রয়াস চালাতে পারে। এই অবস্থায় মিয়ানমারের স্থিতিশীলতা ও সংহতির প্রয়োজনে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সহযোগিতা মিয়ানমার কামনা করে। ইত্যাদি। ... ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের ফিরতি বার্তা তার হস্তগত হয়েছে। রাশিয়া ও চীন মিয়ানমারকে আশ্বস্ত করেছে যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা তাদের সাথে আছে। বিশেষ করে রাখাইনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে মিয়ানমারের যে কোন পদক্ষেপকে তারা অনুমোদন করবে। দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ রক্ষা করতে প্রয়োজনে তারা তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না। ইসরাইল শুধু সম্মতি দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করছে না। ফিলিস্তিন ও রোহিঙ্গাদের একই জাতীয় শয়তানের আছরপ্রাপ্ত দুইটি জাতি আখ্যায়িত করে তারা মিয়ানমারকে নিজের ভাই হিসাবে দেখতে চায়। ভাইকে সহযোগিতা করাটা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। তাদের আছে প্রায় সত্তর বছরের ফিলিস্তিনকে জাতিহীন করার দীর্ঘ চেষ্টার অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা মিয়ানমার শেয়ার করতে চাইলে ইসরাইল সানন্দে তাতে সাড়া দিবে।

তবে ইন্ডিয়ার ফিরতি বার্তা এখনো আসেনি। না আসার পেছনে অবশ্য একটু কারণও আছে। যে বার্তাটি ইন্ডিয়ার ফরেন মিনিস্ট্রির কাছে পাঠানো হয়েছে সেটা নিয়ে ফরেন মিনিস্টারের অনেকের সাথে কথা বলতে হবে। বিশেষ করে প্রাইম মিনিস্টারের ক্লিয়ারেন্স তো অবশ্যই নিতে হবে। এখন ইন্ডিয়া সরকার কীভাবে বিষয়টি দেখে সেটাই দেখার বিষয়।

ইন্ডিয়ার ফরেন মিনিস্ট্রির বৈদেশিক বার্তা আদান-প্রদানের দায়িত্বে আছেন জয়েন সেক্রেটারি মিস্টার এ বি সি। এ বি সি-তে আকাশ বিহারী সূত্রধর যেমন হয় আবুল বাশার চৌধুরীও হয়। তবে জাতীয় পরিচয় পত্রে, পরীক্ষা পাশের সনদে, অফিসের নথিতে আকাশ বিহারী সূত্রধরের একচ্ছত্র রাজত্ব। আবুল বাশার চৌধুরীর অস্তিত্ব কোথাও থাকলে তা একান্ত অন্তর্জগতের বিষয়।

মিস্টার এবিসি লাঞ্চের আগেই মিয়ানমার থেকে আসা বার্তাটি সার্ভ করেছেন। কূটনীতির ভাষা যারা বোঝেন না, তাদের কাছে বার্তাটি সাদামাটা হতে পারে। কিন্তু কূটনীতি-বুঝা লোকদের কাছে তা একটি ভয়ংকর বার্তা। হাজার-হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে হত্যা করার স্বীকৃতি চাইছে মিয়ানমার। রোহিঙ্গাদের প্রজনন সক্ষমতাকে ভেঙ্গে দিতে চাইছে। মধ্যযুগের নারকীয়তা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জনগণের নিরাপত্তার ঢাল হিসাবে ইন্ডিয়াকে দেখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইন্ডিয়া মিয়ানমারের মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চায় চায়নার মতো। কিন্তু চায়না শুধু যে দাঁড়িয়েছে তা না, ইতোমধ্যে আরাম করে বসেও পড়েছে। এই অবস্থায় মিয়ানমারকে খুশি করতে রোহিঙ্গা হত্যা-ধর্ষণকে গণহত্যার পরিবর্তে ' কিছুই হয়নি' বলাটাও ইন্ডিয়ার জন্যে সমস্যা না। কিন্তু মিয়ানমার থেকে আগত বার্তার দুইটি বাক্য তাদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। বার্তায় বলা হয়েছে– পুরো ঘটনাটিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র না দেয়া হলে ইসলামী মৌলবাদিরা এ থেকে ফায়দা নিতে পারে। সঙ্গত কারণেই মুসলিম ছাড়াও অন্য ধর্মাবলম্বী সীমিত সংখ্যক মানুষ ঘটনার শিকার হতে পারেন। এই বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে না দেখে দুই দেশের স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ... ...

অবশেষে হাই কমান্ডের গ্রিন সিগন্যাল আসে। মিস্টার এ বি সি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নেপিদোকে দিল্লির সম্মতি জানিয়ে দেয়। মিস্টার এবিসি বুঝে যায়, রোহিঙ্গা মুসলিমদের উৎখাত করতে ভয়ংকর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আর তা শুরুর তারিখটা হচ্ছে পঁচিশ সেপ্টেম্বর।

মিস্টার এবিসি অস্থিরতায় ভুগছেন। একটা জাতিকে বিনাশের সম্মতি তার হাত দিয়েই দিতে হচ্ছে। মিয়ানমারের রাখাইন বিশ্ব থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। মিস্টার এবিসি মিয়ানমার আর্মির তাণ্ডব অনুমান করার চেষ্টা করেন। দশ-বার লাখ মানুষকে এই সময়ে কয়েকদিনের মধ্যে মেরে ফেলা সম্ভব না। মিয়ানমার আর্মি বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের নিয়ে এমন একটা কিছু করবে, যাতে রোহিঙ্গাদের ভেতরে একটা জান্তব ভয়ের স্রোত তাড়া করে বেড়ায়। সাধারণ মানুষের কাছে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার দাবির চেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না। জান্তব ভয় রোহিঙ্গাদের ধন-মান-সম্ভ্রমকে তোয়াক্কা না করে বেঁচে থাকার আদিম দাবিকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে তাড়িয়ে নেবে। মিস্টার এবিসি আশংকা করছেন, রাখাইনকে রোহিঙ্গাশূন্য না করে এবার আর তারা ক্ষ্যান্ত হবে না। বেশ আঁটঘাট বেঁধেই তারা তৎপরতা শুরু করছে।

অবশ্য বাংলাদেশ যদি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে, তাহলে মিয়ানমারের অপকৌশন ভন্ডুল হবেই। কিন্তু শতভাগ বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলাদেশ রাখতে পারবে কি-না সেটাই দেখার বিষয়। নেতারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিষয়টিকে যদি ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে, তাহলেই হলো।

মিস্টার এবিসি একটু ভেবে বাংলাদেশে ফোন করে। তার এক বন্ধু মানুষ, আলমগীর বাংলাদেশের প্রধান একটি দৈনিকে কাজ করে। আলমগীর ভেতরে ভেতরে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। আলমগীরের কাজ করা পত্রিকাটির মূলনীতি অবশ্য আলমগীরের ভেতরের অবস্থার সাথে যায় না। অনেকটা দায়ে পড়ে বর্ণচোরা হয়েই তাকে পেটের ভাত যোগাড় করতে হয়। এটি অবশ্য আলমগীরের একার সমস্যা না। ধর্মহীন, অতি প্রগতিশীল ধান্ধাবাজরা মোসাহেবি করে শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষাঙ্গণ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মাথায় চড়ে বসেছে। সমাজে নিজের অবস্থান জানাতে হলে তথাকথিত এইসব ধান্ধাবাজ প্রগতিশীলদের কাফেলায় না থেকে উপায় থাকে না। বাধ্য হয়েই সুশীল সমাজের অধিকাংশই ভেতরে ভেতরে ধর্মপ্রাণ মুসলিম হয়েও ধান্দাবাজ প্রগতিশীলদের সাথে ধূয়ো দিতে বাধ্য হচ্ছে। আলমগীর হোসেনদের সভা-সেমিনারের চৈন্তিক অবস্থান এর বাস্তব অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত।

মিস্টার এবিসির সাথে আলমগীরের কথা হয়েছিল দিল্লীতে। প্রাইম মিনিস্টারকে কভার করতে আসা সাংবাদিকদের সাথে আলমগীরও এসেছিল। অনেকের মধ্যে থেকেও মিস্টার এবিসি আলমগীরকে আলাদা করতে পারে। দুইজন মানুষ একই মানসিক চেতনার স্তরে থাকলে কোন মুখোশই তাদেরকে অচেনা থাকতে দেয় না। মিস্টার এবিসির কাছে আলমগীরও অচেনা থাকেনি। গত পাঁচ বছর ধরে তাদের বন্ধুত্ব। আর তা কেবল পেশাগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

মিস্টার এবিসি ফোন কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করে। ওপাশ থেকে শব্দ আসে– হ্যালো মিস্টার এবিসি। অনেকদিন পরে কী মনে করে বন্ধু?

: শোন, এখনই মার্চ করো কক্সবাজারের উদ্দেশে। রোহিঙ্গা মুসলিমরা আসতেছে।

: দোস্ত, রোহিঙ্গারা আসতাছে তা তুমি জানলা ক্যামনে?

: আমাদেরকে জানাইছে তাই জানতে পারছি। আজ চব্বিশ তারিখ, পঁচিশ তারিখেই রাখাইনকে মুসলিমশূন্য করতে অ্যাকশনে নামছে সেনাবাহিনী।

: আর তোমরা সেইটা সাপোর্ট করবা?

: না, মানবতায় বিশ্বাসি, অমানবিক কোন কিছুতে আমরা সমর্থন দিতে পারি না। শোন, চব্বিশ তারিখ এমন কোন ঘটনা ঘটবে বা ঘটানো হবে, যাতে আর্মিদের এই অ্যাকশনকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে বিশ্বের কাছে গল্প ফাঁদা যায়।

: রোহিঙ্গাদের উপর তাহলে আবার অত্যাচার শুরু হচ্ছে?

: কী হচ্ছে জানি না, তবে এবার কিন্তু মিয়ানমারের জান্তারা দ্যা লেডিকে সাথে নিয়ে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে কাজে নামছে। তোমাদের দেশের সরকার এ নিয়ে কী ভাবছে?

: এখনো ভাবেনি, পঁচিশ তারিখের পরে ভাবনা শুরু করবে।

: আমি ভাবতে পারছি না, তোমরা মিয়ানমারের কৌশলটা জানার

পরেও রাখাইনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রেখে একদম নিস্পৃহ হয়ে থাকো কী করে?

: আমাদের কী করার আছে?

: অনেক কিছুই করার আছে। মিয়ানমারের মুভমেন্টগুলো আগে থেকেই জানা থাকলে তোমরা প্রতিরোধমূলক প্রস্তুতি নিতে পারতা। মুসলিম উম্মাহ'র কথা বাদ দিলেও এরা নির্যাতিত হলে এর রেশ তো তোমাদের দেশেই পড়বে। তোমাদেরও তো সাফার করতে হবে।

: শোন বন্ধু, আমরা আগামী কালকের কথা ভেবে আজকের সুখ নষ্ট করি না।

: যা খুশি করো। ফোন রাখছি। ভাল থেকো।

ফোন রেখে আলমগীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

তিন

খবরটা পুংনমছোয়া গ্রামের অনেকেই জানে না। রমজান আলীই জানতে দেয় না। অন্তত আগে বিয়েটা হোক। চোখের ছানিটা সারিয়ে গরু জবাই করে সবাইকে জানালেই হবে। ইমাম সাব আর সাত-আট জনকেই কেবল বলা হয়েছে। এর মধ্যে আতাউর রহমান সস্ত্রীক এসেছেন। নাফিসার জন্যে একটা সোনার চেইন এনেছেন। নাফিসার বাবার সাথে তার বেশ মাখামাখি ছিল। তার ছেলে থাকলে নাফিসাকে নিজের ঘরে তুলতেন। অবশ্য ছেলে থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে ভিন্ন কিছু ঘটার উপায় ছিল না। রমজান আলীর শহীদ দুই ছেলের প্রতিনিধিত্ব করছে আবদুল আজিজ আর নাফিসা। তাদের আর কোন ভাইবোনও নেই। শহীদ দুই ছেলের ধারাকে বইতে দেয়ার এর চাইতে আর কোন ভাল উপায় রমজান আলীর মাথায় আসেনি।

বিয়ে হয়ে গেছে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভোজনপর্বও শেষ। পান মুখে দিয়ে ছেলে-মেয়েকে দোয়া করে রমজান আলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলেও গেছেন আতাউর রহমান ছাড়া বাকি সবাই।

আতাউর রহমান সাহেবের স্ত্রী ভাইবোন থেকে সদ্য স্বামী-স্ত্রী হওয়া আজিজ-নাফিসাকে সামনের জীবনের জন্যে কিছু সবক দিচ্ছেন। বুকের ভিতরে আশার আলো-জ্বলা আলোহীন চোখের রমজান আলী আতাউর রহমানকে বলেন–

: এইবার মনে কয় রোহিঙ্গাদের দুঃখের দিনের অবসান হবে। আমাদের নাগরিকত্ব ফিরায়ে দিবো নিশ্চয়ই।

: আনান কমিশনের রিপোর্টে তো সেই কথাই বলা আছে। তাছাড়া গত ইলেকশনে দি লেডিও নাগরিকত্ব দেয়ার শপথ করছে। তবে চাচাজান, এদের শপথের দাম আছে কি-না সেইটাই হইছে দেখার বিষয়। এই দিকে চাচাজান, আর্মিরা নতুন করে ক্যাম্প করছে সেই খবর রাখেন?

: হ, আব্দুল আজিজ তো সেই কথাই কইলো। আবার কইলো শীতকালীন মহড়া করতে নাকি তারা আসছে।

: মহড়া করলে তো ভালই। তবে চাচা, আমি কোন ভরসা পাই না। আমাদের মতো এদেরও হাত-পা দুইটা করে থাকলেও, এরা তো আমাদের মতো না। আমরা যদি মানুষ হই, তারা কিন্তু মানুষের কাতারে পরবো না। অথবা তারা মানুষ হইলে আমরা মানুষ না। চাচা, আমরা আসলে কী?

রমজান আলীর চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে ওঠে। ছানির আবরণে সেই চিক-চিকানি আতাউর রহমানের চোখে কোন তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু রমজান আলীর গলার কম্পন টের পান আতাউর রহমান। রমজান আলীর সময়টা কাটছে একটা হতাশাকে কেন্দ্র করে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে মেরুদণ্ড সোজা লোকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সবাই আহা-উহু করছে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। বেঁচে থাকার লোভ সবাইকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে। পশুর মতো এমনকি কুকুর-বেড়ালের মতো জীবনকেও তারা মহামূল্যবান মনে করছে। একে বাঁচিয়ে রাখতেই তাদের চিন্তা ক্ষয় করছে। কিন্তু জীবনের সৌন্দর্য নিয়ে তারা ভাবতে পারছে না। অনেকের মাথায় সত্য-সুন্দর-সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্যে যে জীবনকে বাজি রাখা যায়– এই ভাবনাটার ধারণক্ষমতা লোপ পেয়েছে।

রমজান আলী উল্টো প্রশ্ন করেন– তোমার কাছে কী মনে হয়? এখনো কি রোহিঙ্গারা মানুষের কাতারে আছে? এই দেশের প্রত্যেকটা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে রোহিঙ্গাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা বিশ্ববাসী জানে। যাকে জাতির পিতা বলা হয় সেই অং সানের সবচাইতে কাছের তিন জন সহযোগির একজন ছিল রোহিঙ্গা। কিন্তু আজকে রোহিঙ্গাদের মধ্যে সেই অধিকারচেতনা কোথায়?

আতাউর রহমান রমজান আলীর সবটা মেনে নিতে পারেন না। বলেন– রাষ্ট্র যদি পুরা শক্তি নিয়া একদল নাগরিককে ছলে-বলে-কৌশলে নির্বিষ করতে চায়, তাহলে খুব বেশি কিছু করার থাকে না চাচাজান।

আসলে মানুষকে তো দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। রমজান আলী কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু তার আগেই আতাউর রহমান সাহেবের স্ত্রী হালিমা বেগম বরবধূ সাজে আব্দুল আজিজ ও নাফিসাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেন। হালিমাকে রমজান আলীর সামনে নিয়ে বলেন– কদমবুছি করে চাচাজানের দোয়া নেও।

রমজান আলী দু'জনকেই কাছে টেনে নেন। বলেন– তোমরা দুইজন আমার দুই শহীদ ছেলের আমানত। তোমাদের বয়সীরা জানে না, কিন্তু আমরা জানি এবং দেখছি, এই দেশটা আমাদের, রোহিঙ্গাদের।

আমাদের দাদাজান বলছে, এই রাখাইন রাজ্যকে আবাদ করছি আমরা। কিন্তু আজ আমাদের দেশ থেকে আমাদেরকেই তাড়িয়ে দিতে চাইছে। মনে রাখবা, কাপুরুষের দীর্ঘ জিন্দেগির চাইতে সংগ্রামী, সম্মানের সাথে অল্প সময়ের জিন্দেগিও আল্লাহর কাছে উত্তম। আল্লাহ মানুষের জীবনের পূর্ণতা বছর ও সময়ের দৈর্ঘে পরিমাপ করেন না, আত্মত্যাগ ও মহৎ কর্মের মাধ্যমে পরিমাপ করেন। তোমরা জীবনের নতুন একটা অধ্যায়ে আসছো। দোয়া করি, আল্লাহ যেন তোমাদের হায়াতে তাইয়্যেবা দান করেন। হায়াতে তাইয়্যেবা মানে জানো তো। হায়াতে তাইয়্যেবা মানে হলো পবিত্র, আনন্দময় জীবন।

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে আসে সুফিয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে– দাদাজান, আব্দুল আজিজ আর নাফিসারে নিয়া পুবের পহাড়ে চলে যান। দেরি করলে কিন্তু সব্বনাশ হয়ে যাইবো।

সুফিয়ার ঝড়ো আভির্ভাব ঘরের মিষ্টি আবেশকে মুহূর্তেই লণ্ড ভণ্ড করে দেয়। সুফিয়ার চোখ-মুখের ভীতি সবাইকে অনেককিছু বলে দেয় রমজান আলীকে ছাড়া। রমজান আলী ছাড়া বাকিরা বুঝে যায়, ভয়ংকর একটা কিছু তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘটনার

আকস্মিকতায় কেউ কোন কথা বলতে পারে না। রমজান আলী সুফিয়ার মুখ না দেখতে পারলেও গলা চিনে ফেলে। সুফিয়ার নামে আজেবাজে অনেক কথাও তার কানে এসেছে। রমজান আলী বলেন–

: সুফিয়া, শুনছি তুই নাকি তোর জামাইয়ের ঘরেও থাকোস না। আঁৎকা কী খবর নিয়া আইছোস?

: আমি কই থাকি বসে বসে সেই ইতিহাস ঘাঁটলে কাউকে জানে বাঁচতে হবে না।

: শোন, তোর নামে অনেক আজেবাজে কথা হুনছি। কিন্তু আমার লগে হিসাব কইর‍্যা কথা কইবি। জানে বাঁচবো না মানে কী। আমারে মারবো কে?

: তোমারে কেউ মারবো না বুইড়্যা। তবে আব্দুল আজিজকে দেখলেই আর্মিরা গুলি করবো; কারণ সে মরদ পোলা। আর নাফিসারে সাথে নিয়া গিয়া দুইচার দিন পরে গুলি করবো।

সুফিয়ার কথা বিশ্বাস না করে পারছে না। মুহূর্তেই সবার মধ্যে একটা আতংক ভিড় করে। আতাউর রহমান ভয়ে ভয়ে বলেন– আমি যাই চাচাজান। ঘরে কয়েক লাখ কিয়েট আছে, সাথে থাকলে বিপদে কামে লাগবো।

সুফিয়া বলে– চাচা, খুব সাবধান। সন্ধ্যার আগেই কিন্তু আর্মি গ্রাম রেইড দিবো।

আব্দুল আজিজ বলে– আপনি এই খবর জানলেন ক্যামনে?

: আমি অনেক কিছুই জানি। আর তোমাদের জানানোর প্রয়োজন মনে করলাম, জানাইলাম। আমি যাই, আরো অনেকেরেই এই খবরটা জানাইতে হবে।

আরো বেশ কয়েকজনকে পুবের পাহাড়ে চলে আসার সতর্কবাণী প্রচার করে সুফিয়া যখন তার ঘরে আসে তখন সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী আসগর আলীর সাথে দুই বছর ধরে কোন সম্পর্ক নেই সুফিয়ার। অবশ্য তাদের তালাকও হয়নি। সুফিয়ার একটা ছেলে আছে। নাম মাহিন। সুফিয়া দুই-তিন গ্রামের সেরা সুন্দরী। অতি বড় সুন্দরী নাহি পায় বর– সুফিয়া তার বাস্তব উদাহরণ। এমনিতে তাদের সম্পর্ক বেশ গভীর ছিল। শুধু আসগর আলী না, আসগর আলীর বাবা-মাকেও সুফিয়া অতোটাই আপন করে নিয়েছিলো যে, তাঁরা তাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা সুফিয়াকেই বলতেন। সুফিয়াও হাসি মুখে বয়স্ক ছেলেমেয়ের সব আবদার নিজের করে নিতো। বছর ঘুরতেই সুফিয়ার কোলে ছেলে মাহিন আসলো। স্বামী-সন্তান শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে স্বপ্নের মতো পাঁচটি বছর পার করে সুফিয়া। তারপর হঠাৎ করেই বদলে যায় সুফিয়া। স্বামী আসগরকে কাছেই ভিড়তে দেয় না সুফিয়া। কিছুদিন নিজেদের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকলেও আস্তে আস্তে চাউড় হতে সময় লাগেনি। স্বামীর প্রতি সুফিয়ার আকর্ষণ নাই, রোহিঙ্গা কোন পুরুষের প্রতিও নাই। কিন্ত বর্মি আর্মি বা মগদের প্রতি ঠিকই আছে। কানাঘুষা হতে থাকে, সুফিয়া প্রায়ই রাতে বাড়িতে থাকে না। নাসাকা বাহিনীর অনেকের সাথেই তাকে দেখা গেছে। তার বেশভূষাতেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও ছেলের টানে সুফিয়াকে মাঝে-মধ্যেই আসগর আলীর বাড়িতে আসতে হয়। আসগর সুফিয়াকে অপমান-অপদস্ত করে, গায়ে হাত উঠায় পর্যন্ত, কিন্তু তবুও আসে।

সুফিয়াকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দেখেই তেড়ে আসে আসগর। বাইর হ, বাইর হ বাড়ি থেকে। কোন মুখে তুই আমার বাড়িতে আসছোস?

: মাহিন আর আব্বা-আম্মারে নিয়া পুবের পাহাড়ে চলে যাও।

: অ্যাই, তোরে তো বলছি, মাহিনের কাছে তুই আসবি না।

: আমি তার মা, আমাকে তো আসতেই হবে।

: তুই মা না, কালনাগিনী। তোর মতো মহিলা কারো মা হইতে পারে না।

: পারে কি পারে না সেইটা তো কোন কথা না, আমি তো মাহিনের মা হয়াই আছি। মাহিন, বাবা তুমি কই? তোমার মা তোমারে নিতে আইছে।

আসগরের হুমকি-ধমকিকে তোয়াক্কা না করেই সুফিয়া তাদের শোবার ঘরের দিকে ঢুকতে থাকে। চার বছরের মাহিন মায়ের গলা শোনে পাগলের মতো ছুটে আসে। সুফিয়াকে দেখে 'আম্মা' বলে বুকের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। আসগর তেড়ে আসে ঠিকই, কিন্তু মাহিনের উচ্ছ্বাসের কাছে তাকে হার মানতে হয়। আসগর মাহিনের আবেগ দেখে আর একবার বুঝলো, পৃথিবীতে খারাপ স্ত্রী হয়, খারাপ বোন হয়, খারাপ মেয়ে হয় কিন্ত খারাপ মা হয় না। মা-সন্তানের প্রেমের মতো এমন কোন প্রেমও হয় না।

মাহিন সুফিয়াকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। আর যেতে দেবে না। মা-টা বুঝে না, তাকে ছাড়া মাহিনের বুকের ভিতরটা কেমন খা খা করে। আব্বা অনেক আদর করে, মজার মজার জিনিস খেতে দেয়। মাহিন খায়, কিন্তু কোনকিছুতেই সেই খা খা ভাবটা যায় না। তার দাদা-দাদিও তাকে মায়ের কথা ভুলে যেতে বলে। কেন বলে সে জানে না। মা নাকি খারাপ, কিন্তু কী খারাপ মাহিন অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না। হ্যা, আম্মা তাকে ছেড়ে থাকে, অনেকদিন তাকে দেখতে আসে না। মাহিনের ভেতরটা ভেঙ্গে যেতে চায়। মার প্রতি অভিমানও হয়। এবার আসলে মার সাথে আর কথা বলবে না, এমন সংকল্পও সে করে। কিন্তু তার আম্মা খারাপ, সেটা সে মানতে পারে না।

মাহিন আসগর আলী থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। সুফিয়ার বুকে মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি বলে– আম্মা, তুমি আর আমারে ছেড়ে যাইবা না তো!

: না বাপধন, তোমারে ছেড়ে যাইবো না, তোমারে নিয়া যাইবো।

: আমারে নিয়া কই যাইবা আম্মা?

: সে অনেক কথা। যাইতে যাইতে বলবো।

মাহিনকে নিয়ে সুফিয়া চলে যেতে থাকে। আসগর আলী তাকে বাধা দেয়। পথ আগলে দাঁড়ায়– সাবধান, আমার ছেলেরে নিয়া তুই যাইবি না।

: শোন, একদম মরদগিরি ফলাইবা না। মাহিন তোমার একলার না, মাহিন আমারও ছেলে। আমি জেনে-বুঝে আমার ছেলেরে মৃত্যুর মধ্যে ফেলে রাখতে পারি না।

: তুই একটা বাজে মেয়েছেলে, তোর কথার সত্যতা কী?

: সত্য-মিথ্যা আর দশ মিনিট পরেই বুঝবা। হোন, ঘরে কিয়াট যদি কিছু থাকে লয়া তাড়াতাড়ি আমার পিছে পিছে আসো।

সুফিয়া মাহিনকে কোলে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করে। আসগর আলী একমুহূর্ত ভাবে। সুফিয়াকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। সে অর্থ সংগ্রহের জন্যে দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করে।

আব্দুল আজিজ যখন নাফিসা আর দাদাজানকে নিয়ে পুবের পাহাড়ের দিকে পা বাড়াতে উদ্যত হয়, ঠিক তখনই তার মোবাইলে একটা কল আসে। তার দোকানের কর্মচারি রফিক তাকে ফোন করে। আব্দুল আজিজ ফোন তুলে বলে– রফিক, এখন কথা বলতে পারবো না। আমরা বাড়ি ছেড়ে যাইতেছি।

: একদম যাইবেন না। সারা গ্রাম আর্মি ঘেরাও করে রাখছে। বের হলেই আপনি মারা পড়বেন আর ভাবীসাব জানোয়ারদের হাতে পড়বো।

: কিন্তু এখানে বন্দি হয়ে মরার চাইতে একটু চেষ্টা করে দেখি।

: চেষ্টা করেন, কোথাও লুকায়া থাকার চেষ্টা করেন, আমি পরে আপনারে কল করে সার্বিক পরিস্থিতি জানাইতেছি।

: তুমি কি দোকানে?

: দোকান বলতে কিছু নাই। পুরো বাজার আগুন দিয়া পুড়ায়া দিছে। বাজারের পাশে যে মসজিদ আর ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ছিল, তাও পোড়ায়া দিছে।

ফোনে কথা বলা শেষ করতে পারে না আব্দুল আজিজ, প্রথম দ্রুম আওয়াজটা কানে আসে। আব্দুল আজিজের দুইটা হাত দুইজন ধরে রেখেছে। একটা নাফিসা আরেকটা রমজান আলী। দ্রুম শব্দটা কানে যেতেই দুইটা হাত আরও শক্ত করে আব্দুল আজিজকে আঁকড়ে ধরে। নাফিসার গলায় বাঁচার আদিম আকুতি ভর করে।

: এখন কী হইবো দাদাজান?

রমজান আলীর গলা অনেকটাই স্বাভাবিক। বলে– আব্দুল আজিজ, আমার ঘরে চল।

: ঘরে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না দাদাজান। একটা শেল মারলে ঘরও পুড়বো, আমরাও পুড়বো।

রমজান আলীর গলায় এবার আদেশের স্বর আসে– কী হইবো সেই চিন্তা পরে। যা কইছি সেইটা কর।

আব্দুল আজিজ রমজান আলীকে নিয়ে তার ঘরে আসে। একটু পর পর দ্রুম দ্রুম শব্দ ভেসে আসছে। উত্তর দিক থেকে মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। ধূয়া কুন্ডুলি পাকিয়ে আকাশে উড়ছে। একটু পরে ধূয়ার ভেতর থেকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। শিখার ভেতর থেকে আগুনের জিব আকাশটাকে গ্রাস করতে চাইছে। আব্দুল আজিজের বুকের ভেতরে মৃত্যুর পোকারা বেসুরো বাজনা বাজাচ্ছে।

: দাদাজান, ঘরে আগুন লাগায়া দিতাছে!

নাফিসাও সায় দেয়। দাদাজান, ঘরে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত।

দাদাজান দু'জনকে নিয়ে তাঁর ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়ায়। হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। জায়নামাজটা সরা।

আব্দুল আজিজ নাফিসার দিকে তাকিয়ে ঘরের মেঝেতে রাখা জায়নামাজটা সরায়। ঘরের মেঝেতে জায়নামাজের সমান মাপের একটা দাগ লক্ষ করে তারা। মাঝখানে একটা লোহার আংটা। আংটাকে খাঁজ করে মাটির সাথে এমনভাবে লাগানো, প্রথম দেখায় কিছুই মনে হয় না। রমজান আলী বলে–

: মাঝখানের আংটা দেখছোস? এইটা হইছে ঢাকনা।

আব্দুল আজিজ অবাক হয়। কিসের ঢাকনা দাদাজান?

: আগে ঢাকনাটা ওঠা। নাফিসা, তুই আব্দুল আজিজকে সাহায্য কর?

আব্দুল আজিজ নাফিসাকে নিয়ে ঢাকনাটা সরায়। জায়নামাজের মাপের সিমেন্টের একটা স্লাব। বেশ ভারী। সরাতে বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু সরিয়ে বেশ অবাক হয়। একটা বেশ বড়সড় সুড়ং।

রমজান আলী বলেন– মোবাইলের লাইট জ্বালায়া আস্তে আস্তে নীচে নাইম্যা ঢাকনাটা আবার জায়গা মত বসায়া দে।

আব্দুল আজিজ ও নাফিসা কিছুই ভাবতে পারছে না। তারা এক বাড়িতে থেকেও দাদাজানের ঘরের এই সুড়ং-এর রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। তাদের ভেতরে অনেক প্রশ্ন ঘাঁই মারছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন করার সময় না। এখন জীবনকে নিরাপদ করার সময়।

তারা সুড়ং-এর ভেতরে গিয়ে ভেতর থেকে ঢাকনাটা লাগিয়ে দেয়। জায়নামাজটি আগেই ঢাকনার উপর সেট করে রাখা হয়েছিল। তারা তিনজন প্রাণী ভিতরে, কিন্তু ঘরের উপরের পরিবেশটি আগের মতোই আছে। সুড়ং-এর ভিতর প্রবেশ করে রমজান আলী হাতড়ে ম্যাচ খুঁজে আলো জ্বালায়। কেরোসিনভর্তি একটা হারিকেন আগে থেকেই সুড়ং-এর ভিতরে ছিল, তাতে আলো দেয়া হয়। সুড়ং-এর ভিতরটা আলোকিত হয়। প্রায় চার ফুট চওড়া, হামাগুড়ি দিয়ে সহজেই সামনে যাওয়া যায়। ভূমি থেকে দশ ফুট গভীরে চার ফুট চওড়ার সুড়ং দিয়ে তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগুতো থাকে। আব্দুল আজিজ হারিকেন হাতে সবার সামনে, তার পিছনেই রমজান আলী, নাফিসা সবার পিছনে। প্রায় ত্রিশ ফুট এগিয়ে আরেকবার অবাক হয় আব্দুল আজিজ। এখানে সে সড়ং-এর চরিত্র বদলে যেতে দেখে। একটা আট বাই দশ ফুট সাইজের ছোট্ট কক্ষের মতো আকার নেয় সুড়ংটা। এখানে উচ্চতাও বেশ সহনীয়। একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো উচ্চতা। শুধু তাই না, খড়ের উপর চাদর পে তে এখানে একটা বিছানাও করা আছে।

রমজান আলী বসে দম্ নেয়। আব্দুল আজিজ ও নাফিসা তার পাশ ঘেঁষে বসে। রমজান আলীর বেশ পরিশ্রম হয়েছে। তাদেরও হয়েছে, কিন্তু তারুণ্য তাদের ঘায়েল করতে পারেনি। আব্দুল আজিজ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বলে– এই সুড়ং-এর কথা তো কোনদিন আপনি বলেন নাই দাদাজান।

: বলার দরকার হয় নাই, তাই বলি নাই।

: কিন্তু এই সুড়ং বানাইছে কে?

: কে আবার বানাইবো, আমি বানাইছি।

নাফিসা ও আব্দুল আজিজ দু'জনেই হোঁচট খায়। রমজান আলীর মতো একজন বৃদ্ধের পক্ষে এইরকম পরিশ্রমসাধ্য কর্ম করা সম্ভব বলে তারা মানতে পারছে না। নাফিসা বলে–

: এইটা কোনমতেই সম্ভব না দাদাজান। আপনি একলা এই সুড়ং

কোনদিনও বানাইতে পারবেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রমজান আলী বলেন– সম্ভব-অসম্ভবের কতটুকু তুই বুঝোস বইন। মানুষ যে কি পারে না, সেইটাও সে জানে না। আসলে এই সুড়ংটা আমি বানাইছি, আমার নিজেরও বিশ্বাস হইতে চায় না। কিন্তু আসলে এইটাই চরম সত্যি। আমি একলা এইটা বানাইছি এবং আমি ছাড়া আজ তোরা দুইজন প্রথম এইটার কথা জানলি।

রমজান আলী দশ ফুট মাটির গভীরে তাঁর দুই ছেলের দুই উত্তরাধিকারীর কাছে নিজের কথা বলে যায়। রমজান আলীর চোখের সামনেই তার দুই ছেলেকে তাদের পরিবারসহ মেরে ফেলা হয়েছে। তাদের অপরাধ তারা ছিল রোহিঙ্গা মুসলিম এবং বয়সে তরুণ। আর্মি ও মগদের সবচাইতে ভয় শিক্ষিত রোহিঙ্গাদের। সরকারি চাকুরিতে কোনো রোহিঙ্গা যেতে পারে না। বাধ্য হয়ে শিক্ষিত রোহিঙ্গারা নিজেদের চেষ্টায় মক্তব মাদ্রাসা তৈরি করে সীমিত চেষ্টায় রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। মিয়ানমার আর্মির প্রথম টার্গেট এরা। মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষক ও মসজিদের ইমামরা অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রথম উপাদানই এরা। এদেরকে ধ্বংস করা গেলে রোহিঙ্গাদের মধ্যে কোনদিনই নেতা তৈরি হবে না। এর পরেই তরুণ ও সক্ষম পুরুষদের টার্গেট করে আর্মিরা। একটা জাতির প্রাণশক্তি এরা। জাতিকে ধ্বংস করতে হলে এদের হত্যা করা অপরিহার্য। যুবতি নারী হলো নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির উৎস। একটি জাতির সম্ভ্রম আত্মমর্যাদা এবং জীবনীশক্তির উৎসও নারী। নারীত্বের উপর আঘাত মানেই একটি জাতিকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়া। আর্মিরাও এই কাজটি করে যাচ্ছে ষাট বছর ধরে।

রোহিঙ্গাদের উপর বর্বরতা জাতিগত নিধন নাকি গণহত্যা– বিশ্বের বোদ্ধারা যখন এই বিতর্ক নিয়ে ভেবে ভেবে চুল পাকাচ্ছে, রমজান আলী তখন মাটির দশ ফুট গভীরে নিজের প্রচেষ্টায় তৈরি সুড়ং-এ বসে তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আব্দুল আজিজের পিতা-মাতাকে রমজান আলী কথা দিয়েছিলেন, তাদের আব্দুল আজিজকে তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করবেন। ৯০ সালের জাতিগত নিধন বা গণহত্যার সময় দেয়া কথার সাথে ২০১২ সালের নাফিসার বাবা-মাকে দেয়ার কথাও যোগ হয়। রমজান আলী ভাবেন আর ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হতে থাকেন, কী ভাবে এদের তিনি রক্ষা করবেন। প্রশিক্ষিত আর্মির চোখ এড়িয়ে দু' জন যুবক-যুবতিকে কীভাবে তিনি রক্ষা করবেন? যদিও রোহিঙ্গা জাতিকে টিকে থাকতে হলে আব্দুল আজিজ আর নাফিসাদের জীবনকে অবশ্যই নিরাপদ রাখা ছাড়া কোন পথ নেই। তিনি অনেক বিনিদ্র রজনী কাটান। অবশেষে এই সুড়ং করার চিন্তা মাথায় আসে। এই ব্যবস্থা জীবননাশের প্রাথমিক ধাক্কা কেটে জীবনকে প্রলম্বিত করতে সাহায্য করবে। গভীর রাতে তিনি এই সুড়ং খুড়তে থাকেন। প্রত্যেকদিন খুবই অল্প অল্প করে মাটি বের করতে থাকেন, যাতে কারো চোখে না পড়ে। দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিন্দু বিন্দু চেষ্টা মিলে অবশেষে সিন্ধু হয়। সুড়ং তৈরি হয়ে যায়।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে তারা সুড়ং-এর ভেতর। বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সুড়ং-এর ভেতর বাতাস আসার জন্যে দুটো পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাতাসের সাথে কিছু দুর্বোধ্য শব্দও তারা পেয়েছে। কিন্তু এই শব্দ থেকে বাইরের দুনিয়ার কোন ধারণা তারা করতে পারেনি। আব্দুল আজিজ ঘড়ি দেখে বুঝেছে, রাতের খাওয়ার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। রমজান আলী খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে। নাফিসা তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে।

আব্দুল আজিজ বলে– দাদাজান, রাত দশটার বেশি বাজে। উপরে কী হইতেছে কিছুই তো জানি না। একবার গিয়া দেখে আসব?

রমজান আলী চিন্তা করে। বলে– চল আমিও যাইতেছি। আর হোন, সুড়ং-এর শুরুতেই ডানদিকে দেখবি চিড়া-মুড়ি-গুড় আছে। বাইরে বাইর হওয়ার সময় নিয়া যাইতে হবে।

নাফিসা বলে– আর যদি বাইরের পরিবেশ ঠিক না হয়া থাকে?

: ঠিক না হইলে বাইরে যাইবো না। হোন, সাতদিন এই সুড়ং-এ থাকার মতো রসদ কিন্তু আছে। মটকা ভর্তি পানি আছে বাম দিকে।

আর্মির অ্যাকশন শেষ হয়েছে। রাত দশটার দিকে তারা ক্যাম্পে চলে গেছে। পুবের পাহাড় থেকে গ্রামটিকে জ্বলতে দেখেছে সুফিয়া। পুরো গ্রামটিকেই জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ধোঁয়া আর আগুনের শিখা আকাশকে অন্যরকম আলোকিত করেছে। সুফিয়ার সাথে ভয়ার্ত স্বামীও দেখেছে গ্রামটিকে পুড়তে। দ্রুম দ্রুম গুলির আওয়াজও পেয়েছে। মানুষের খালি গলার আওয়াজ এতদূর আসার কথা না। বন্দুকের গুলি আর আগুনে পোড়ার শব্দের তলে মানুষের আহাজারি তলিয়ে যায়। আবছা একটা কোলাহলের মতো সুফিয়ার কানে আসে ঠিকই, কিন্তু তা মানুষের কি-না বুঝা যায় না।

আগুনের তেজ কমে গেছে। ধোঁয়া এখনো বের হচ্ছে। শিখাও দুই এক জায়গায় উঁকি দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই লেলিহান ভাবটি আর নেই। একটা পাহাড়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে জঙ্গুলে পরিবেশে সুফিয়া মাহিনকে কোলে নিয়া বসে গ্রামের এই তান্ডব দেখেছে। আসগর আলীও আছে তার পাশে। তার শ্বশুর শাশুড়িও আছে। গ্রামের আরো পাঁচ-সাত জন নারী-পুরুষ তাদের সাথে আছে। মাহিন সুফিয়ার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুফিয়া মাহিনকে আসগরের কোলে দেয়। বলে– আমি একটু গ্রামটা দেখে আসি।

আসগর আলী সুফিয়াকে ঘৃণা করতে চায়, কিন্তু পারে না। সুফিয়া আসগরকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না সত্যি, আসগরের পৌরুষে সুফিয়া ঝাঁপটা মারে তাও সত্যি, কিন্তু তবু সুফিয়ার ভেতরে আসগরের একট জায়গা ঠিকই আছে। আসগরের তাই মনে হয়। আসগর এবার আর রাগ করে না। অনেকটা মোলায়েম করেই বলে– এখন যাওয়ার দরকার কি? আর্মিরা গেছে, কিন্তু বৌদ্ধ মগরা তো আছে!

: আর্মি-পুলিশ ছাড়া মগরা কিছু না। হেদের জোরেই তাদের জোর। এখন মগরাও বাড়ি গেছে।

প্রায় মাইল দেড়েক পাহাড়ের পথ ভেঙ্গে গ্রামে আসতে হয়। সুফিয়া অন্ধকারে চলাফেরায় অভ্যস্থ। মৃত্যু ভয় তার তেমন একটা নাই। মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়েই সে ঘোরে। মেয়ে মানুষের একাকীত্বের ভয়টাও তার পাঁচ বছর আগেই কেটে গেছে। রোহিঙ্গা কোন পুরুষকে সে পরোয়া করে না। আথাড়ে-পাথাড়ে ঘোরাঘুরি করার সুবাধে কায়দা বুঝে দু'একজন রোহিঙ্গা পুরুষ যে তার পিছু নেয়নি তা কিন্তু না। দু'একজন অন্ধকারে তাকে ঝাঁপটেও ধরেছে। কিন্তু তার কাছে এমন অভ্যর্থনা পেয়েছে, তারা আর ভুলেও এ কাজ করতে আসেনি,

অন্যদেরও সতর্ক করে দিয়েছে। তাই রোহিঙ্গা কোন পুরুষ তাকে আর ঘাঁটায় না। সুফিয়া আর্মি-পুরুষ-মগদের সাথে খাতির করতে দেখা গেছে, কিন্তু রোহিঙ্গা কোন যুবকই তার কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।

সুফিয়া তার গ্রামটাকে চিনতে পারছে না। মাহিনের বাবার বাড়ি কোনটি, কিছুতেই ঠাওর করতে পারছে না। পুরো গ্রামটাকেই জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। অক্ষত কোন ঘর নেই। গাছপালাও এখনো জ্বলছে। ধোঁয়া আর উৎকট গন্ধে একটা ভীবৎস পরিবেশ। আগুনের লাল আলোয় অন্ধকার পালিয়েছে, জীবনের সাড়া শব্দও অনুপস্থিত। সুফিয়া আন্দাজের উপর তার স্বামীর ভিটাটা খোঁজার চেষ্টা করে। কয়েকটি মৃতদেহ দেখতে পায় সে। সবগুলোই অল্প ও মধ্য বয়সের পুরুষের মৃতদেহ। কেউ উপুর হয়ে পড়ে আছে, কেউ মুখ থুবড়ে আছে। নারী দেহ নেই। সুফিয়া জানে, এখানে নারীদের মারা হয়নি। যুবতি দেখতে ভাল সব মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্যাম্পে ভাগ হবে। অল্প বয়সী, সুন্দরী কুমারী মেয়েরা আর্মি অফিসারদের ভাগে পরবে। তবে এখানেও আর্মি নিয়ম মেনেই সব করবে। সবচাইতে বড় র‍্যাংকের অফিসার পাবে সবচাইতে আকর্ষণীয়া রোহিঙ্গা নারী। এইভাবে ক্রমান্বয়ে জুনিয়র অফিসার ও সিপাহিরাও বাদ যাবে না। পাঁচজন সাতজনের একেকটা গ্রুপ করে একজন নারীকে উপহার হিসাবে দেয়া হবে।

আর্মিদের সহযোগি মাবাথা'র মগ বৌদ্দরাও পাবে। তারা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। রোহিঙ্গা নারীদের ভাগাভাগিতেও তারা সাম্যবাদী নীতি মেনে চলে।

সুফিয়া ঘুরে দেখছে। প্রায়-বৃদ্ধ এক মহিলাকে পাগলের মতো মৃতদেহ উল্টেপাল্টে দেখতে দেখছে সে। অনেকক্ষণ ধরে সে দেখছে। এক পোড়া ভিটে থেকে অন্য ভিটাতে ছুটতে দেখছে। সুফিয়াও তাকে অনুসরণ করছে। কিন্তু মহিলার সে খেয়াল নাই। সুফিয়া তার কাছে যায়। বলে– চাচি, আর্মিরা লাশ নিতে গাড়ি নিয়া আসবে। তাড়াতাড়ি পালায়া যান, নইলে মারা পড়বেন।

: আম্মা গো, আমার বাপের লাশটা পাইছি, আমার মেয়ে সখিনার লাশটা পাইতেছি না কেন?

: মেয়েরে এইখানে মারে নাই, তাই পান নাই। শোনেন চাচি, আমি আর্মিদের কায়দা-কানুন জানি। এখনই পিকআপ নিয়া লাশ নিতে আসবো। আপনারে দেখলেই গুলি করবো চাচি।

মহিলা সুফিয়ার কথা শুনতে পেরেছে কি-না বুঝা যাচ্ছে না। সে আগের মতোই মৃতদেহ উল্টেপাল্টে কাউকে খুঁজছে। এই খোঁজাটাই যেন তার নিয়তি। মেয়েকে অথবা মেয়ের মৃতদেহ তাকে পেতেই হবে। সুফিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে সামনের দিকে পা বাড়ায়।

সুফিয়া তার স্বামীর ভিটা এখনো সনাক্ত করতে পারেনি। পোড়া টিন, পোড়া গাছপালা, ছাই-ভস্ম, ধোঁয়া আর আগুন সব একাকার করে দিয়েছে। একেকটা বাড়ি মানে একেকজন মানুষের সৃষ্টিশীলতা, আলাদা আলাদা রুচি বৈশিষ্ট্য। তাই তো খুব সহজেই অমুকের বাড়ি, তমুকের বাড়ি বলা যায়। কিন্তু আগুন সাম্যবাদি চরিত্রের। সব একাকার করে দিয়েছে।

সুফিয়া একটা ভিটায় এসে দাঁড়ায়। অনেকটা হাতড়ে সে অনুমান করে নিয়েছে, এটাই তার স্বামীর ভিটা। তবে কোন ভিটাই যে থাকবে না, তা ভালই জানে সুফিয়া। এই জমি আর কোনদিনও ফেরত পাবে না রোহিঙ্গারা। এই জমি সরকার নিয়ে নিবে। রোহিঙ্গাদের কোন জমিই থাকবে না।

সুফিয়া চোখটাকে ঘুরিয়ে পুরো গ্রামটিকে দেখতে চেষ্টা করে। একটু দূরে তিনটি মানুষের ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করতে দেখে সে। সুফিয়া আন্দাজ করার চেষ্টা করে, ছায়ামূর্তিরা যেখানে নড়াচড়া করছে, সেটি আব্দুল আজিজের ভিটা হতে পারে। সে দ্রুত সেদিকে পা বাড়াতেই তার পায়ের কাছে কিছু একটা নড়ে উঠে। চমকে উঠে সুফিয়া। একটা পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে। খালি গা, কোমড়ে নীচে একটা ময়লা হাফপ্যান্ট। সুফিয়া অন্ধকারে চলতে অভ্যস্ত। ভয়ও সে তেমন পায়নি। কিন্তু বাচ্চাটি তাকে কিছুটা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

: অ্যাই, তুই কে? এখানে কী করছিস?

কোন উত্তর নাই। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

: তুই কার ছেলে? তোর বাপ-মা কই?

: নাই। মাইর‍্যা ফেলছে।

সুফিয়া আর কিছু বলতে পারে না। সে সামনে এগুতে থাকে। ছেলেটিও তাকে অনুসরণ করে। সুফিয়ার তেমন কোন ভাবান্তর নেই। পাঁচ বছরের একটা অবুঝ শিশু, যার বাবা-মা দু'জনকেই একটু আগে মেরে ফেলা হয়েছে– এমন একটি শিশুর জন্যে বুক ঠেলে কান্না আসা উচিৎ সুফিয়ার। কিন্তু আসছে না। পরিবেশ মানুষকে নিষ্ঠুর করে দেয় কিন্তু মানুষকে অমানুষ করতে পারে না। সুফিয়া জানে, বাচ্চা ছেলেটি তাকে পায় পায় অনুসরণ করতেই থাকবে। সুফিয়া তার নিজের ছেলের কথা ভাবলে একে ধমকে সরিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু এতটা অমানুষ সে হতে পারে না। এতটুকু নির্ভরতায় যদি ছেলেটি বেঁচে যায় যাক না! সুফিয়া জীবন্ত তিনটি ছায়ামূর্তির দিকে পা বাড়ায়।

সুড়ং থেকে বের হতে তাদের অনেক কসরত করতে হয়েছে। সুড়ং-এর মুখ আধাপোড়া টিন আর কাঠ-আসবাবের পোড়া ছাই ও আধাপোড়া জঞ্জালে ঠাসা। রমজান আলীর যে খাটটিতে শুয়ে রোহিঙ্গাদের কথা ভাবতেন, সেটি এখনও জ্বলছে। তাপ কমে এলেও এখনও যথেষ্টই আছে। আবদুল আজিজ আর নাফিসা অনেক খেটে, শরীরের অনেক জায়গায় আগুনের ছ্যাকা খেয়ে সুড়ং-এর মুখ খুলতে পারে। তারা বের হয়ে রমজান আলীকে সুড়ং থেকে বের করে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। রমজান আলী চোখে দেখতে না পারলে কী হয়েছে বুঝতে পারে। কোনরকম ভূমিকা না করেই তিনি বলেন– সব পুড়ায়া দিছে, তাই তো?

কেউ কোন কথা বলে না। রমজান আলী কারো উত্তর আশাও করে না। সে আবারও নিজে নিজেই বলেন– আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আমার পাঁচ বছরের কষ্ট সফল হইছে। আমি তোদের দুইজনকেই বাঁচাইতে পারছি। ইয়া পাক পরোয়ার দেগার, তোমার করুণার কোন শেষ নাই।

(অসমাপ্ত)

সম্পদ আপনার - ঝুঁকি আমাদের!
আপনার সম্পদের অগ্নি, নৌ, মটর বিবিধ ঝুঁকি বহন করে থাকে রাষ্ট্রীয় খাতে সাধারণ বীমা'র একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমান, তেল-গ্যাস উত্তোলন, ওভারসীস মেডিক্লেইম, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমাসহ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বীমার ঝুঁকিও বহন করে থাকে।
দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন'।
SADHARAN BIMA CORPORATION
রাষ্ট্রীয় খাতে সাধারণ বীমা'র একমাত্র প্রতিষ্ঠান
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা, বাংলাদেশ।
(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই
পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-এর
শুভেচ্ছা
মাসিক কিস্তি ভিত্তিক হজ্জ একাউন্ট
মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব
মুদারাবা স্টুডেন্ট (মাইনর) সঞ্চয়ী হিসাব
মাসিক জমা ভিত্তিক মেয়াদী সঞ্চয়
মাসিক জমা ভিত্তিক বিবাহ সঞ্চয়
যানবাহন খাতে বিনিয়োগ
লা-রিবা মাস্টার কার্ড
আল-আরাফাহ্ এসএমই
সযত্ন সেবায়, আল-আরাফাহ্
শিল্প খাতে বিনিয়োগ
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
বৈদেশিক বাণিজ্যিক বিনিয়োগ
দ্বিগুন ও তিনগুন আমানত প্রকল্প
এজেন্ট ব্যাংকিং
কৃষি খাতে বিনিয়োগ
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
العرفة اسلامی بنك لمیتید
Al-Arafah Islami Bank Limited
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
শরীয়াহ্ ও আধুনিক ব্যাংকিং এর এক অনন্য সমন্বয়
প্রধান কার্যালয়: আল-আরাফাহ টাওয়ার, ৬৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন: +৮৮-০২-৪৪৮৫০০০৫
ই-মেইল: info@al-arafahbank.com, www.al-arafahbank.com

কক্সবাজার ভ্রমণ গাইডলাইন

মেহেদী হাসান শাকিল

ঘুরতে আমরা কে না ভালবাসি। সবাই কম-বেশি ঘুরাফেরা করে থাকি। শহরের এই যান্ত্রিক জীবনে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাই, কিংবা অবসর সময় খুজে পাই, তখনই আমাদের ঘুরতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে একটু সময় শুধু নিজের জন্যে কিংবা একান্ত আপনজনের সাথে ব্যয় করতে। এজন্য চাই সময়, সুযোগ আর সামান্য পরিকল্পনা। কিন্তু এই সময়, সুযোগ ও পরিকল্পনা নামক বিষয়গুলো একই সুতোয় গাঁথা হয়ে উঠে না। পাহাড়ে, নদীতে নৌকা ভ্রমণ, সবুজের মাঝে জ্যোস্নার খেলা, এমনকি মেঘের রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো চোখ জুড়ানো কিংবা আবার কখনো সমুদ্রর বিশালতার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো পর্যটন স্থান রয়েছে এই বাংলাদেশে। অপরুপ সৌন্দর্যের এই দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক ঘুরে বেড়ানোর জন্য প্রতিবছর ভিড় জমিয়ে থাকেন বাংলাদেশে।

আজকে কক্সবাজার ও এর দর্শনীয় স্থানসমুহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, যা ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য ভ্রমণ গাইড হিসেবে কাজ করবে।

দেশের ভিতরে ভ্রমণের চিন্তা করলেই সর্ব প্রথমে মাথায় আসবে অবশ্যই কক্সবাজারের কথা। বিশ্বের সবচাইতে বড় সমুদ্রসৈকত এটি। শুধুমাত্র দেশীয় পর্যটক না, দেশের বাইরে থেকেও প্রতিবছর প্রচুর পর্যটক বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ এই সমুদ্র সৈকত দেখতে আমাদের এই দেশে আসেন। বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, সারি সারি ঝাউবন, সৈকতে আছড়ে পড়া বিশাল ঢেউ। এখানকার সমুদ্রের পানিতে বড় বড় ঢেউয়ের মাঝে গোসল, সকালবেলা দিগন্তে জলরাশি ভেদ করে রক্তবর্ণের থালার মতো সূর্য। অস্তের সময় দিগন্তের চারিদিকে আরো বেশি স্বপ্নিল রঙ মেখে সে বিদায় জানায়। কলাতলী ও লাবণী সমুদ্র সৈকত হচ্ছে প্রধান ২ টি সমুদ্র সৈকত। এছাড়া রয়েছে হিমছড়ি, ইনানী সমুদ্র সৈকত। শুধু সমুদ্র সৈকতই নয় কক্সবাজার শহরের বার্মিজ মার্কেট, শুটকি বাজার, বৌদ্ধ মন্দির (রামু) ইত্যাদি কক্সবাজার ভ্রমণের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। রয়েছে মেরিন ড্রাইভ। মেরিন ড্রাইভ দিয়ে সমুদ্রের বিশালতা এবং অসীম সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাবে। এসব সৌন্দর্যের পসরা নিয়েই বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে রচনা করেছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। কক্সবাজারে থাকার জন্য এখন অনেক আধুনিক হোটেল মোটেল রয়েছে। ফাইভ স্টার হোটেল থেকে শুরু করে কম দামি বিভিন্ন মোটেলও রয়েছে।

আজকে আমার লেখাতে কক্সবাজার ভ্রমণের সকল তথ্য দেওয়া চেষ্টা করব

কক্সবাজার সম্পর্কিত কয়েকটি সাধারণ তথ্য :

নামকরণ কক্সবাজারের আদি নাম পালংকী। কথিত আছে, ১৭৯৯ সালেক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামের একজনএখানে এসে একটি বাজার স্থাপন করেন। আর তার নাম অনুসারে কক্স সাহেবের বাজার এবং পরে কক্সবাজার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সীমানা চট্টগ্রামে অবস্থিত এ জেলার মোট আয়তন ২৪৯১.৮৬ বর্গ কিলোমিটার। কক্সবাজারের উত্তরে চট্টগ্রাম, পূর্বে-বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও মিয়ানমার, পশ্চিম ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

নদী মোট ৫টি নদী রয়েছে এ জেলাতে। এগুলো হলো- মাতামুহুরী, বাঁকখালী, রেজু, কোহালিয়া ও নাফনদী।

দ্বীপ সেন্টমার্টিন দ্বীপ ছাড়াও এখানে আকর্ষণীয় ৫টি দ্বীপ রয়েছে। এগুলো হল- মহেশখালী, কুতুবদিয়া, সোনাদিয়া, শাহপরীর দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন।

কলাতলী ও লাবণী সৈকত

জেলা শহর থেকে নিকটে হওয়ার কারণে কলাতলী এবং লাবণী সৈকত পর্যটকদের নিকট প্রধান আকর্ষণ। সৈকতের দুইটি পয়েন্টের মাঝের দূরত্ব মাত্র পনের মিনিট। এখানে পাওয়া যায় ঝিনুক মার্কেট এ ছাড়া ছোট-বড় অনেক দোকান যেখানে নানা রকম জিনিসের পসরা দিয়ে সাজিয়েছে দোকানিরা। সৈকতে আছে বেশকিছু রেস্টুরেন্ট, যেখানে বসে এক মগ কফি পান করতে করতে মনোরম সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়।

হিমছড়ি

কক্সবাজার শহর থেকে মাত্র ১২ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত এই হিমছড়ি। কক্সবাজার থেকে সেখানে ৩ ভাবে যাওয়া যায়। খোলা জীপ (চান্দের গাড়ি), রিকশা কিংবা অটো রিকশাতে করে সেখানে যাওয়া যাবে। অপরুপ ঝর্ণা এখানকার প্রধান আকর্ষণ (যদিও ঝর্ণাটি এখন মৃতপ্রায়)। হিমছড়ি যাওয়ার পথে আর একটি আকর্ষণ হল- পথের বামে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ ঘেরা পাহাড় আর ডানদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি থেকে ধেয়ে আসা অনবরত ঢেউয়ের খেলা। পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের দৃশ্য অসাধারণ।

ইনানী সমুদ্র সৈকত

কক্সবাজার থেকে হিমছড়ি পাড় হয়ে আরও ৮ কি.মি পূর্বে রয়েছে আরেক আকর্ষণ সৈকত ইনানী, যাকে বলা হয়, মিনি সেন্টমার্টিন। অভাবনীয় সৌন্দর্যে ভরপুর সৈকতটি দিনকে দিন অধিক পর্যটক প্রিয় একটি জায়গা হিসেবে পরিচিত লাভ করছে। এখানে রয়েছে বিস্তীর্ণ পাথুরে সৈকত। ভাটার সময় এখানকার সমুদ্রের মাঝে অনেক প্রবাল পাথর দেখা যায়। সমুদ্র থেকে ভেসে এসে এখানকার ভেলা ভূমিতে জমা হয়েছে প্রচুর প্রবাল।

মেরিন ড্রাইভরোড কক্সবাজারঃ

মেরিন ড্রাইভ কক্সবাজার ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সড়ক, যা সমুদ্ররের পাশ দিয়ে কক্সবাজারের কলাতলী সৈকত থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বর্তমানে পৃথিবীর দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ সড়ক।

এই রোডের একদিকে রয়েছে উত্তাল সমুদ্র সৈকত অন্যদিকে রয়েছে সবুজে ঘেরা ছোট বড় পাহাড়। আবার কোথাও কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণার দেখা মিলে। রোড দিয়ে যেতে যেতে সাগরের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও জেলেদের সমুদ্রে মাছ ধরার দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সেই সাথে দেখা মিলবে টেকনাফ গর্জন ফরেস্ট খ্যাত চিরহরিৎ বন। কলাতলী বা সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে চান্দের গাড়ী (খোলা জীপ), মাইক্রোবাস, সিএনজি কিংবা অটোরিক্সায় মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে হিমছড়ি ও ইনানী সমুদ্র সৈকত হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত যাওয়া যায়।

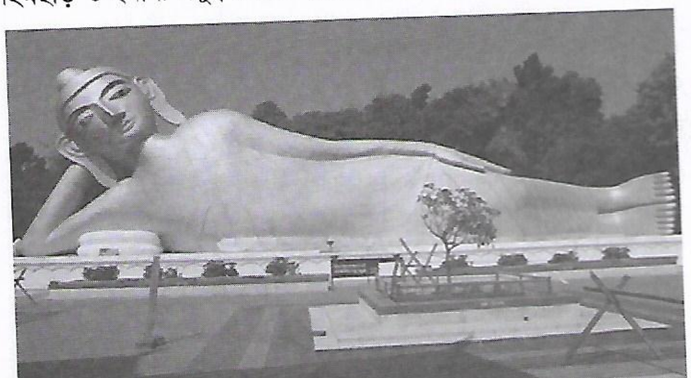

বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম চর্চা কেন্দ্র রামু :

কক্সবাজারের নিকটতম উপজেলা রামু। এখানকার রাংকুট বনাশ্রমে সংরক্ষিত রয়েছে সম্রাট আশোকের সময়কার বুদ্ধ মূর্তি। মহামূল্যবান পাথর, ব্রুঞ্জ, সোনার তৈরি মূর্তি রয়েছে। ছয় ফুট উঁচু পাটাতনে স্থাপিত রয়েছে মহামতি গৌতম বুদ্ধের তের ফুট দীর্ঘ ব্রঞ্জ মূর্ত। আজ পর্যন্ত এটি বাংলাদেশে ব্রুঞ্জ নির্মিত বুদ্ধের সর্ববৃহৎ মূর্তি। পাশেই উত্তর মিঠাছড়ি বনবিহারে নির্মিত হয়েছে বুদ্ধের ১০০ ফুট দীর্ঘ শয়ন মূর্তি।

মহেশখালী ও সোনাদিয়া দ্বীপ :

দীর্ঘদিন আগে এক প্রবল ভূমিকম্পে জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দেশের একমাত্র এই পাহাড়ি দ্বীপ। কক্সবাজার থেকে নৌপথে মহেশখালীর দূরত্ব ১২ কিমি। স্পিডবোটে যেতে সময় লাগে বিশ থেকে চল্লিশ মিনিট। বাংলাদেশের অন্যতম শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা মহেশখালীতে অবস্থিত। এখানে আছে জলাভূমি আর প্যারাবন। শীতের মৌসুমে এখানে প্রচুর অতিথি পাখির সমাগম ঘটে। এ ছাড়া এখানে পাহাড় চূড়ায় রয়েছে আদিনাথ মন্দির। মহেশখালী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আর একটি দ্বীপসোনাদিয়া। অপরূপ সৌন্দর্যের এই দ্বীপের আয়তন লম্বায় ৭ কিমি প্রস্থ ২.৫ কিমি। সোনাদিয়ায় রয়েছে অনন্য সুন্দর নিরিবিলি সমুদ্র সৈকত। সাগর ঘেরা দ্বীপে রয়েছে কেয়া-নিশিন্দার ঝোপ, ছোট বড় খাল বিশিষ্ট প্যারাবন। আরো আছে বিচিত্র প্রজাতির জলচর পাখি। এই সৈকত জুড়ে রয়েছে অজস্র লাল কাঁকড়া।

কক্সবাজারে যাতায়াত সম্পর্কিত তথ্য:

যাতায়াত :

ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য বাসের পাশাপাশি রয়েছে বিমানের সুবিধা। তা ছাড়া ট্রেনে করে চট্টগ্রাম গিয়ে সেখান থেকে বাসে করে কক্সবাজার যাওয়া যায়। ঢাকা থেকে ট্রেনেযেতে কমলাপুর থেকে ট্রেনে উঠতে হবে। ঢাকা থেকে প্রায় দশটির মত ট্রেন বিভিন্ন সময় ছেড়ে গেলেও ভ্রমণের সুবিধার্থে রাত্রের ট্রেন গুলো পছন্দ করাই উচিত। ভোরে চট্টগ্রাম পৌঁছে সেখান থেকে কক্সবাজারের বাস করে ২ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছানো যায়।

১। ৭২২ মহানগর এক্সপ্রেস:ঢাকা থেকে ছাড়বে রাত ০৯:০০ এ। চট্টগ্রাম পৌঁছাবে ভোর ০৪:৩০ এ। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন রবিবার।

২। ৭৪২ তূর্ণা এক্সপ্রেস: ঢাকা থেকে ছাড়বে রাত ১১:৩০ এ। চট্টগ্রাম পৌঁছাবে ভোর ০৬:২০ এ। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন নেই।

৩। ০২ চট্টগ্রাম মেইল: ঢাকা থেকে ছাড়বে রাত ১০:৩০ এ। চট্টগ্রাম পৌঁছাবে সকাল ০৭:২৫ এ। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন নেই।

তূর্ণা এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে বাসে সেন্টমার্টিন পরিবহন, গ্রীন লাইন পরিবহন, সোহাগ পরিবহন, শ্যামলী, এস আলম, হানিফ, সৌদিয়া, টিআর ট্রাভেলসসহ বিভিন্ন বাসে সব সময় আসা যায়। এসি/ননএসি দুই ধরনের বাস আছে। বাসগুলো সরাসরি কক্সবাজার পৌছে যায় ভোরে। বিমানেও মাত্র ৪৫ মিনিটে কক্সবাজারে যাওয়া যায়। নিয়মিতবাংলাদেশ বিমান, জিএমজি এয়ার লাইনস, নভোএয়ার, ইউএস বাংলা ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজসহ অন্যান্য বিমান আসা যাওয়া করে।

বিচ ফটোগ্রাফি: কক্সবাজারে পর্যটন মৌসুমে বিচ ফটোগ্রাফার পর্যটকদের ছবি তুলে থাকে। এই সব ছবি মেমরি কার্ড এ নেয়া যায়। এছাড়া প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসব ছবি প্রিন্ট করে নেগেটিভসহ পর্যটকদের হাতে পৌছানোর ব্যবস্থা রয়েছে। লাল পোশাক পরা এসব বিচ ফটোগ্রাফারদের প্রত্যেকের রয়েছে একটি করে আইডি কার্ড।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রথমত, কক্সবাজার যাওয়ার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, প্রতি বছর সমুদ্রের পানিতে গোসল করতে গিয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটে মূলত সতর্কতা ও সচেতনতার অভাবে। এছাড়া, লাবণী পয়েন্ট থেকে কলাতলী সৈকত পর্যন্ত বেশকিছু গুপ্ত খাল রয়েছে। অসাবধানতার কারণে বেশীর ভাগ পর্যটক ভাটার সময় নেমে এই খালে পড়ে প্রাণ হারায়। সুতরাং, ভাটার সময় সৈকতে গোসল করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকির সংকেত অনুসরণ করে সৈকতে গোসলে নামলে বিপদ থেকে দূরে থাকা যায়। চৌকি থেকে ভাটা ও জোয়ারের সময় অনুযায়ি লাল ও সবুজ পতাকা উত্তোলন করা হয়। সবুজ পতাকার সময় গোসল করা নিরাপদ। প্রয়োজনে সাথে লাইফ জ্যাকেট রাখা যেতে পারে। প্রবাল সাধারণত ধারাল হয়ে থাকে। সুতরাং, ইনানি ও সেন্টমার্টিনের সৈকতে প্রবালের ওপর হাঁটার সময় সাবধানে হাটতে হবে।

***সৈকতের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে এবং জীববৈচিত্র্যকে নিরাপদ রাখার খাতিরে কোনো প্রকার আবর্জনা এবং অপচনশীল দ্রব্য যেমন, পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল ইত্যাদি ফেলা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকের দায়িত্ব।

This Blog created by ভ্রমণ wcqvmy Mehedi Hasan Shakil

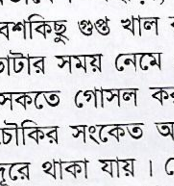

Written by : Mehedi Hasan Shakil
B.Sc. in CSE
Mobile: 01751281061
Email: mehedi3618@gmail.com

নারী ও শিশু নির্যাতন : প্রতিকার

মোঃ আবু তোরাব

যুগ যুগ ধরে নারী ও শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। অতীতে নারী ও শিশু নির্যাতন হত অন্যভাবে আর বর্তমান আধুনিক যুগেও ঠিক তেমনি আধুনিক কায়দায় নির্যাতন হচ্ছে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, নির্যাতনের পদ্ধতি এবং কম আর বেশী।

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশের মত আমাদের বাংলাদেশেও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা। যেমন বেড়েছে ঘরে বাইরে, রাস্তা-ঘাটে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ সহ অপহরনের মত বড় ঘটনা। যার মধ্যে কিছু প্রকাশ পায় আর বেশির ভাগ ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায় রাজনৈতিক ও লোকলজ্জার কারণে। আর এসব ঘটনায় নির্যাতিত নারী ও শিশুদের রক্ষার্থে ২০০০ সালে সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন তৈরি করে যা পরবর্তীতে ২০০৩ সালে সংশোধন করে আরো কঠোর করা হয়।

আইনঃ

* আমরা জানি যে নারী ও শিশু নির্যাতন মূলক অপরাধগুলো কঠোর ভাবে দমনের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু দমন আইন ২০০০ নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যা খুবই কার্যকর। পরবর্তীতে এই আইনের কিছু ধারা সংশোধন করা হয় ২০০৩ সালে যা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন আইন ২০০৩ নামে পরিচিত।

* এই আইনের মূল উদ্দেশ্য নারী ও শিশুকে সুরক্ষা দেওয়া অর্থাৎ এই আইন দ্বারা নারী ও শিশুকে বিভিন্ন নির্যাতন ও অপরাধের শিকার হতে রক্ষা করা হয়।

নারী ও শিশু যে সব অপরাধের শিকার হন :

নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে যেসব নির্যাতন ও অপরাধ সংঘঠিত হয় তার মধ্যে অন্যতম অপরাধগুলো মিম্নে উল্লেখ করা হল।

- যৌতুক
- মুক্তিপণ আদায়
- এসিড নিক্ষেপ
- যৌতুকের জন্য মৃত্যু
- নারী বা শিশু পাচার ,ঘটানো।
- নারী ও শিশু অপহরণ ।
- ধর্ষণ
- ধর্ষণ জনিত মৃত্যু।
- নরী আত্নহত্যায় প্ররোচনা
- যৌন নিপীড়ন
- ভিক্ষাবৃত্তি এবং এসবের উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানি ইত্যাদি।

অপরাধের শাস্তি :
বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ সংশোধিত ২০১৩ অনুযায়ী উল্লেখিত অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধের সর্বোচ্চ সাস্তি যাবজ্জীবন থেকে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। এছাড়া রয়েছে অর্থ দণ্ডের বিধান।

মামলা ও বিচার পদ্ধতি :
আমরা জানি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন একটি বিশেষ আইন তাই এই আইনের অধীনে মামলা সমুহও বিশেষ আদালত হয়ে থাকে অর্থাৎ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে হয়ে থাকে।

কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইবুনাল সংঘটিত অপরাধের অবিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করতে পারে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৮ নং ধারা অনুযায়ী ট্রাইবুনাল বিচারের জন্য মামলা গ্রহণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে তদন্ত অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পুলিশ বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে অপরাধ সংঘঠনের সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে তা হলে ধরাপড়ার ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে।

আর যদি অপরাধ ব্যক্তিকে হাতে নাতে ধরা না যায় তাহলে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তি তারিখ হতে পরবর্তী ৬০ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে।

যদি কোন কারণে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করা না যায় তাহলে তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করে অতিরিক্ত ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ সম্পন্ন করিবেন এবং বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচার কার্য করিবে আর যদি উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারে। আর যদি জামিন না দেওয়া হয় তাহলে ট্রাইবুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।

সাধারণত এই আইনের সকল অপরাধ অ-জামিন যোগ্য। তবে নরী /শিশু/ বৃদ্ধ শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ট্রাইবু নাল জামিন মঞ্জুর করিতে পারে।

সর্বশেষ সংশোধনীর ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন না হলে অভিযুক্ত কে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাবে না। ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ রায় বা দণ্ড দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হয় তাহলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আদেশ রায় বা দণ্ডের তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে হাই কোর্ট বিভাগে আপিল করতে পারবে।

৫। মিথ্যা নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা করার ফলাফল :

অনেক সময় দেখা যায় যে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কিংবা হিংসা পরায়ণ হয়ে অথবা লোভে পড়ে এই আইনের অধীনে মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করেন যা আইনে দন্ডনীয় অপরাধ অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন আর তা যদি আদালতে মিথ্যা বলে প্রমাণ হয় তাহলে যিনি এই মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং যিনি করিয়েছেন উভয়ই অনধিক ৭ বছর কারাদণ্ডে দন্ডিত হবেন এবং সেই সাথে অর্থদণ্ড।

৬। বিনা ফিতে প্রতিকারের জন্য যারা সহযোগিতা করবে ঃ

আপনি যদি মামলা করতে অসমর্থ হন বা হুমকির সম্মুখীন হন বা সুবিধাবঞ্চিত তাহলে বাংলাদেশে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা জন্য জেলা লিগ্যাল এইড এবং কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন রয়েছে যারা আপনাকে আর্থিক ও আইনী সহযোগিতা করবে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ;

- জেলা লিগ্যাল এইড অফিস,হটলাইন - ০১৭৬১-২২২২২২-৪
- জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা
- বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি
- বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড (ব্লাস্ট)
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
- নরী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্র।

মো: আবু তোরাব
এল এল বি (অনার্স),এল এল এম
আই টি পি (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)
This Blog created by ভ্রমণ পিয়াসু Mehedi Hasan Shakil
Written by : Mehedi Hasan Shakil
B.Sc. in CSE
Mobile: 01751281061
Email: mehedi3618@gmail.com

ঈদুল ফিতর : উদযাপন পদ্ধতি

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– 'এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।' [বাকারা : ১৮৫]

বরকতময় রমযান মাস কেটে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এই পুণ্যময় মাসে আমাদেরকে যতটুকু নেক আমল করার তাওফিক দান করেছেন তার জন্য আমরা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। এই মাসে আমরা যা কিছু ভুল ত্রুটি করেছি, তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করছি এবং প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেন। শাবানের প্রথম দিন। ঈদুল ফিতর। ঈদের দিন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে দ্বিগুণ শুকরিয়া জ্ঞাপনের দিন। আমরা তাঁর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যেই উপস্থিত হই।

ঈদের নামায : অতিরিক্ত তাকবীর

ঈদের নামাযের কথা কুরআনে কারীমেই রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– 'এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালনা করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।' [বাকারা : ১৮৫]

এই পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যারা হেদায়েতের পথ খুঁজে পায়নি। কারণ, তারা হেদায়েতের পথ দেখতেই চায়নি। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সে পথ দেখাননি। আল্লাহ তায়ালার তাওফিক ও অনুগ্রহে আমরা সে পথ দেখতে চেয়েছি। আল্লাহ আমাদেরকে সে পথ দেখিয়েছেন। মুমিন বান্দা হিসেবে কবুল করেছেন। আমল করার তাওফিক দিয়েছেন। আমলের প্রতি আগ্রহ দান করেছেন। রমযানের পুরো মাস আমরা রোযা রেখেছি, তেলাওয়াত করেছি, নামায পড়েছি। এজন্য আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহিমা ঘোষণা করা আমাদের কর্তব্য। আয়াতের এই অংশে একটি ইংগিত রয়েছে। সেই ইংগিত উপলব্ধি করা কেবল হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষেই সম্ভব। আমাদের পক্ষে নয়। এ কারণেই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– অতিরিক্ত তাকবীরসহ ঈদের নামায-এর বিধান আহরণ করেছেন। অতঃপর অতিরিক্ত তাকবীরগুলোকে ঈদের নামাযের শামিল করে দিয়েছেন। এভাবে একটি ইংগিতকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা মুজতাহিদগণের সাধ্যের ব্যাপার নয়। এটা কেবল রাসূলের পক্ষেই সম্ভব এবং এটাই রাসূলের মানসাব।

এর আরেকটি নজির দেখুন, কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় ইরশাদ হয়েছে– 'আকীমুস সালাহ'– যথাযথ যত্নের সাথে নামায পড়। প্রশ্ন হলো, নামায কী, কীভাবে তাকে পড়া হবে? আর নামাযের প্রতি যত্ন নেয়ারই বা অর্থ কি? এসব বিষয় অনুধাবন করা কেবল রাসূলের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, রাসূল বুঝেন সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে। এ কারণেই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়গুলো পূর্ণ ব্যাখ্যার সাথে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন।

একইভাবে সদ্য পঠিত আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালার মহিমা বর্ণনা করার কথা আছে। কিন্তু কীভাবে মহিমা বর্ণনা করা হবে, এ কথা কেবল রাসূলই বলতে পারেন। আর রাসূল বর্ণনা করেন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত হওয়ার পর। এ কারণেই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলিভাবে উম্মতকে বুঝিয়েছেন, রমযান মাস সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হয় দ্বিগুণ। আর তার পদ্ধতি হলো শহর এবং বড় বড় গ্রামের লোকজন একত্রিত হয়ে ঈদের নামায আদায় করবে। আর নামাযে বিশেষভাবে 'আল্লাহু আকবার' অতিরিক্ত সংযোজন করবে। প্রথম রাকাতে তিনবার দ্বিতীয় রাকাতে তিনবার। অতিরিক্ত এই ছয়টি তাকবীরও ওয়াজিব। ঘর থেকে ঈদগাহে আসার সময় এই তাকবীর উচ্চারণ করতে করতে আসবে।

নামাযের পর দোয়া ও দোয়ার আদব

রোযার আলোচনার মাঝখানে একটি আয়াত এসেছে– 'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক। যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।' [বাকারা : ১৮৬]

মানুষ হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল– আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের খুব নিকটে যে আমরা তাঁকে অনুচ্চস্বরে ডাকবো, না তিনি অনেক দূরে যে আমাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে হবে? এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলে দেয়া হয়, আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, তখন তাদের বলে দিন– আমি নিকটেই আছি। সুতরাং উচ্চৈঃস্বরে ডাকবার প্রয়োজন নেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কাকুতিভরে গোপনে ডাক।'

একবার হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। মুসলিম বাহিনী উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করছিলেন। তখন তাদের লক্ষ করে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'নিশ্চয়ই তোমরা কোন বধির কিংবা দূরবর্তী সত্তাকে ডাকছো না।'

অর্থাৎ তোমরা এমন সত্তাকে ডাকছো যিনি তোমাদের নিকটেই আছেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা। সুতরাং নিচুস্বরে ডাকো।

এজন্যই দোয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হলো বিনয়ের সাথে কাকুতিভরে প্রার্থনা করা। এই আয়াত এখানে এজন্য উল্লিখিত হয়েছে– ঈদের নামাযের পর দোয়া করতে হয়। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি মানুষের ডাকে সাড়া দিই। তাদের দোয়া কবুল করি। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়। আমার নির্দেশ মান্য করে। আমার প্রতি যেন আস্থা রাখে। তাহলে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে।

আয়াতের সার কথা হলো, আজ আমাদেরকে সর্বপ্রথম দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করতে হবে। তারপর দোয়া করতে হবে। তারপর খুতবা।

ঈদের নামায আদায় পদ্ধতি

যাদের জানা নেই তাদের জন্য ঈদের নামায আদায় করার পদ্ধতি বলে দেয়া হলো। সর্বপ্রথম নিয়ত করতে হয়। নিয়ত হলো অন্তরের বিষয়। তবে মুখে বলা ভালো। জরুরি নয়। নিয়ত এইভাবে করবেন– আমি ইমামের এক্তেদায় ঈদের নামায আদায় করছি। নিয়তের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কথা পূর্ব থেকেই আপনাদের অন্তরে রয়েছে। এখানে এই উদ্দেশ্যেই আগমন করেছেন। তারপরও বিষয়টি নামায শুরু করার আগে মনে আরেকবার স্মরণ করা জরুরি। আর মুখে বলে নিলে আরও ভালো। সাধারণত আমাদের মধ্যে নিয়ত বলতে যে কথা প্রচলিত আছে তা হলো– আমি কেবলামুখী হয়ে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায আদায় করছি। এগুলো সবই অপ্রয়োজনীয় কথা। নামায তো আমরা কেবলামুখী হয়েই পড়ি। আর ঈদের নামায তো দুই রাকাতই হয়। তাই এটা মুখে বলার কী প্রয়োজন আছে? অতিরিক্ত ছয় তাকবীরও ঈদের নামাযের একটি জরুরি বিষয়। সুতরাং এটাও বলার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, 'ইমামের অনুসরণে' এ কথা বলার প্রয়োজন আছে। কারণ ইমামের এক্তেদার নিয়ত না করলে মুক্তাদীর নামায হবে না। প্রশ্ন, কেউ যদি বলে– আমি তো ঘর থেকে ঈদের নামায পড়ার নিয়তেই এসেছি। তাহলে দ্বিতীয়বার নিয়ত করারই বা কি প্রয়োজন? উত্তর হলো, এই প্রশ্ন যথার্থ। তবে নিয়ত তাকবীরে তাহরীমার সাথে মিলিত হওয়া ভালো। যেমন এক ব্যক্তি নামাযের নিয়ত করেছে। তারপর কেউ কানে কানে এসে তাকে কিছু বললো। সে কান কথা শোনে নামায শুরু করছে। এক্ষেত্রে তাকে পুনরায় নিয়ত করতে হবে। কারণ, নিয়ত তাকবীরে তাহরীমার সাথে মিলিত হওয়া উত্তম।

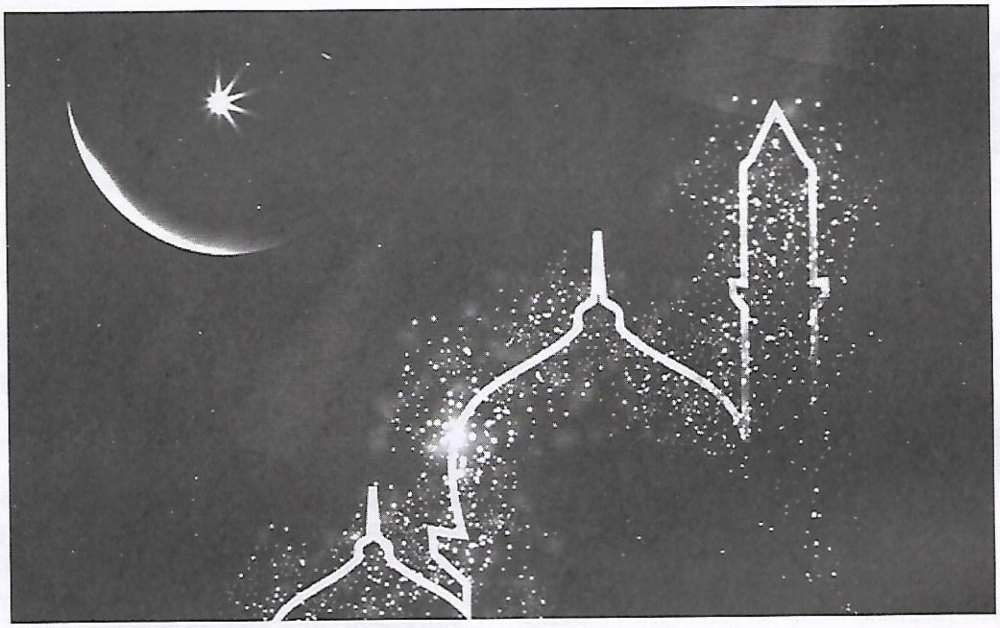

তারপর ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন। ইমামের সাথে মুক্তাদীগণও হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তাকবীরে তাহরীমার পর হাত বাঁধবে। অন্যান্য নামাযের মতো ছানা পাঠ করবে। ছানা পাঠ করার পর নীরব থাকবে। তারপর ইমাম একে একে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবেন। মুক্তাদীগণও ইমামের সাথে হাত তুলে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর বলবে এবং হাত ছেড়ে দেবে। তৃতীয়বার তাকবীর বলার পর হাত বাঁধবে। তারপর ইমাম কেরাত পাঠ করবেন। সূরা ফাতেহা পড়বেন। সাথে কোন সূরা পড়বেন। তারপর যথারীতি রুকু সেজদা করবেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে কেরাত শুরু করবেন। সূরা পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহু আকবারের আওয়াজ শোনা যাবে। এই আওয়াজ শোনে কেউ রুকুতে যাবে না। এটা অতিরিক্ত তাকবীর। হাত তুলে মুক্তাদীগণও অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। এভাবে তৃতীয় তাকবীর শেষ হওয়ার পর চতুর্থ তাকবীরের পর রুকুতে যাবে এবং যথারীতি নামায পূর্ণ করবে।

যদি মুক্তাদীর ভুল হয়ে যায় আর সে তাকবীর শোনে রুকুতে চলে যাওয়ার পর দেখে মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে সেও দাঁড়িয়ে যাবে। এতে কোন সমস্যা নেই। ইমামের পেছনে যদি ভুল হয়, তাহলে সেটা মাফ। তবে উচিত হলো, রুকুতে থেকেই তাকবীর বলা। না দাঁড়ানোই উচিত। কারণ, ফরয থেকে ওয়াজিবের দিকে ফিরে আসা জায়েয নেই।

যদি ইমাম এই ধরনের ভুল করেন এবং রুকুতে যাওয়ার পর মনে হয় তাহলে ইমামও রুকুতেই অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। যদি পেছনের লোকদের লুকমা শোনে ইমাম তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে এটা ভুল হবে। ফরয থেকে ওয়াজিবের দিকে ফেরা সঙ্গত নয়। কিন্তু যদি দাঁড়িয়ে যায় তাহলে দাঁড়িয়েই তাকবীর বলবে। তারপর রুকু করবে। তবে সেজদায়ে সাহু করবে না। অবশ্য অন্য নামাযে এই জাতীয় ভুল হলে সেজদায়ে সাহু করতে হতো। কিন্তু ঈদের নামাযে সেজদায়ে সাহু করতে হবে না। কেননা ঈদের নামাযে সাধারণত বিশাল ভিড় হয়। তাই এক্ষেত্রে মাসআলা হলো, ঈদের নামাযে যদি ভুল হয়ে যায় এবং কোন ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে সেখানে কোন সেজদায়ে সাহু নেই।

নামায শেষ হওয়ার পর দোয়া হবে। দোয়ার মূল বিষয় হলো, প্রত্যেক মুসল্লি আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজের মনের আরজু পেশ করবে। তবে কিছু বিষয় এমন আছে যা সকলের কাছেই প্রার্থনীয়। এজন্য ইমাম প্রথমে কিছু উচ্চৈঃস্বরে দোয়া পাঠ করবেন। তারপর তিনি নীরব হয়ে যাওয়ার পর সকল মুসল্লী নিজ নিজ আরজু ও কামনা আল্লাহ তায়ালার কাছে পেশ করবে।

খুতবা শোনা ওয়াজিব

দোয়ার পর ইমাম সাহেব খুতবা দিবেন। ঈদের খুতবা সুন্নত। তবে তা শোনা ওয়াজিব। সালাম দেয়া যেমন সুন্নত অথচ তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং সকলেই নিজ নিজ আসনে বসে পুরো খুতবা শুনবেন। খুতবা সমাপ্ত হওয়ার পরই যার যার ঘরে যাবেন।

ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা এবং মুয়ানাকা

এক্ষেত্রে একটি বিশেষ রেওয়াজ চালু আছে যে, নামাযের পরই মানুষ মুয়ানাকা করার জন্যে হামলে পড়ে। আলেমগণ লেখেছেন, এটা হয়তো বা রেওয়াজ অথবা বেদআত। যদি কেউ এই মুয়ানাকার বিপরীতে কোনরূপ সওয়াবের কল্পনা করে তাহলে বেদআত হবে, অন্যথায় রেওয়াজ। আর এ জাতীয় রেওয়াজ থেকেও বিরত থাকা উচিত। নামায আল্লাহ তায়ারা হুকুম। আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করতে গিয়ে কোনরূপ রেওয়াজ বা বেদআত পালন করা উচিত নয়।

ঈদের দিনে মিষ্টান্নের বিধান

আরেকটি জরুরি কথা, তা হলো মিষ্টান্ন রান্না। এটাও একটা রেওয়াজ। বেদআত নয়। কারণ, এটা কেউ সওয়াবের উদ্দেশ্যে করে না। প্রচলিত একটা রেওয়াজ। তবে ঈমানদারদের জন্যে এ জাতীয় রেওয়াজও যত্নের সাথে পালন করা উচিত নয়। ঈদের দিন যদি কিছু রান্না করা হয় তাহলে পোলাও রান্না করুন। অথবা অন্য কিছু রান্না করুন। সবাই একই রকমের মিষ্টান্ন রান্না করতে হবে– এটা কেমন কথা! এ জাতীয় বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ অনেক সময় দীনকে আক্রান্ত করে। ধর্মের মধ্যে যখন রেওয়াজ ঢুকে পড়ে তখন ধর্মের প্রকৃত রূপ আর অবশিষ্ট থাকে না।

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি– তিনি আমাদেরকে মুমিন বান্দা হিসেবে কবুল করেছেন। তাঁর বিধানাবলী মানার তাওফিক দিয়েছেন। শুকরিয়া আদায় করতে পারা একটা অনেক বড় গুণ। আল্লাহ তায়ালা এটা খুবই পছন্দ করেন।

'স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন- তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিবেন। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি কঠোর।' [ইবরাহীম : ৭]

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যে আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার তাওফিক দান করেছেন, এটাও একটা নেয়ামত। এই নেয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যদি আমরা এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আরও ইবাদতের তাওফিক দিবেন। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞতা আল্লাহ তায়ালার কাছে চরম অপছন্দনীয়। এর শাস্তিও ভয়াবহ। ইরশাদ হয়েছে–

'মুসা (আ.) বলেছিলেন, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।' [ইবরাহীম : ৮]

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলে তিনি নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন। অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। তিনি কারও প্রতি মুখাপেক্ষী নন। বান্দার অকৃতজ্ঞতার দ্বারা তাঁর শান বড়ত্ব কোন কিছুতেই কোনরূপ অপূর্ণতার সৃষ্টি হবে না। যদি আমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, তাহলে এর লাভ ভোগ করবো আমরাই। তাই আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের সর্বদাই শুকরিয়া আদায় করুন। নিজেদের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাওবা করার দ্বারা বান্দার তাওবা খুব দ্রুত কবুল হয়। ঈদের এই মুহূর্তে সকলেই জীবনব্যাপী আল্লাহ তায়ালার বিধানমত চলবার অঙ্গীকার করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁর বিধানাবলী মাফিক জীবন যাপন করার তাওফিক দিন। দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাদেরকে সকল কল্যাণ নসীব করুন।

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

ঈদুল ফিতরে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সদকায়ে ফিতর ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। অনেকেই হয়তো সদকায়ে ফিতর আদায় করেই নামাযে আসেন। আর যারা আদায় না করেই ঈদগাহে যান তারা নামাযের পর আদায় করে দিবেন।

শাওয়ালের ছয় রোযা

সর্বশেষ যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তা হলো, শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি রমযানের রোযার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো সে যেন পুরো বছর রোযা রাখলো। তাই আল্লাহ তায়ালা যাদের তাওফিক দিয়েছেন তারা যেন ছয়টি রোযা অবশ্যই রাখেন। ঈদের দ্বিতীয় দিন থেকেই এই রোযা শুরু করে দেয়া ভাল। এতে রোযাগুলো আদায় করা সহজ হয়। তবে ঈদের পর পরই রাখা জরুরি নয়। শাওয়াল মাসের যে কোন সময় ভিন্ন ভিন্নভাবেও রাখা যেতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দিন।

*[*মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরীর ঈদ সম্পর্কে একটি বয়ানের অনুবাদ থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত; অনুবাদ: মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন]*

"বাঙলাকথা
■ লেখা পাঠান ■ নিয়মিত পড়ুন ■ বিজ্ঞাপন দিন
আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন ১১

কুরআন নাযিল ও কুরআন বিজয়েরও মাস মাহে রমযান

মোঃ মিজানুর রহমান

"শাহরু রামাদানাল্লাজী ওনযিলা ফিহিল কুরআন, হুদাল্লিননাস্ ওয়াবাইয়িনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান।" (সুরা বাক্বারা-১৮৫)। অর্থাৎ "রমজান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী"।

রহমত, মাগফেরাত ও নাযাতের মাস মাহে রমজান বছর ঘুরে আবারও আমাদের মাঝে উপস্থিত। মাহে রমজান সম্পর্কে প্রতি বছরই প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায়, বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে ও ইফতার মাহফিলে আমরা সিরিজ আলোচনা পর্যালোচনা শুনে থাকি যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল মাহে রমজানের রহমত, বরকত, মহত্ব, বড়ত্ব ও ফজিলত। তাছাড়াও আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ অন্য মাসের সত্তরটি ফরজের সমান, একটি নফল একটি ফরজের সমান। এ মাসে এক টাকা দান করলে ৭০০ টাকা দান করার সওয়াব, তাছাড়া এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক বলেছেন, "রোজা শুধু আমার জন্যই রাখা হয়, কাজেই এর পুরস্কার আমি রোজাদারদেরকে আমার নিজ হাতে প্রদান করব"। আরও বলা হয়েছে জান্নাতের একটি দরজার নাম হচ্ছে "আর রাইয়ান"। কিয়ামতের দিবসে শুধু রোযাদারদেরকেই এই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অন্য কাউকে নয়। কিন্তু কেন? কেন এত আয়োজন, এত ফজিলত? এর পেছনে কারণ কি?

এর মূল কারণ হল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দুনিয়ার শত কোটি মানুষকে সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দেননি যে, তারা দুনিয়াতে মারামারি, কাটাকাটি করবে কিংবা যেমনে খুশী তেমনি চলবে বা তাদের জীবন পরিচালনা করবে। মানুষগুলো যেন একটি নিয়ম মাফিক সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে দুনিয়াতে চলতে পারে এবং তার বিনিময়ে কাল কিয়ামতে তারা আল্লাহর কাছে মুক্তি পেতে পারে, সে চলার একটি গাইড বা হেদায়েত আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন এ মাসে নাজিল করেছেন। আর সে গাইডই হল মহাগ্রন্থ "আল কুরআন"। আর এ

কুরআন রমজান মাসের শেষ দশকের যে কোন এক বেজোড় রাত্রিতে (কদর রাত্রিতে) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর উপর নাযিল হয়। সে কারণেই কদর রাত্রি হাজার মাস থেকে উত্তম বলে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন। আর এ কদরের রাত্রি যেহেতু রমজান মাসে, এ কারণেই রোযার মাসের এত মর্যাদা, এত মহত্ব এবং এত গুরুত্ব।

এ মাসের মর্যাদার ব্যাপারে একটি ছোট উদাহরণ এমনভাবে দেয়া যায় কোন একটি দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যদি কোন দেশ সফরে যান, তাহলে তাঁর সম্মানে সে দেশের রাস্তাঘাটগুলো বিভিন্ন রং বেরঙের পতাকা, ফেস্টুন ইত্যাদি দিয়ে অতি সুন্দরভাবে সাজানো হয় এবং লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়, ইত্যাদি। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সম্মানের কারণেই এমনটি করা হয়। ঠিক তেমনি রমযান মাসকেও আল্লাহ তায়ালা এত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন শুধু এ মাসে মানবতার একমাত্র হেদায়েত, একমাত্র গাইড আল-কুরআন নাযিলের কারণে, অন্য কোন কারণে নয়।

TRACC

Training Research and Consultancy Center

We have pleasure to inform you that TRACC is started its Journey. We have Training, Research and Consultancy Services.

Training

Invitation for One/Ten Day(s) Training Course on: "Income Tax Management" for any Company, Firm and all individuals in our office or you can get our services facilities into your Company premises and Expression of Interest (EoI) for appointment of corporate tax adviser/ consultant/ to prepare and submit to NBR Company Income Tax Return and Individual Income Tax Return

Why you come here/ offer us

The following issues would be discussed in details with practical orientation during training session:

1. Income Tax Ordinance-1984
2. Income Tax Rules-1984
3. Relevant SROs with their latest changes
4. Finance Acts
5. Case Laws
6. Avoidance of Double Taxation
7. Procedure of claiming Refund
8. Avoiding of penalty and prosecutions
9. Assessment procedures
10. Risk areas of universal self assessment
11. Tax Audit
12. Tax payment procedure
13. Withholding tax
14. Submission of withholding tax return
15. Tax appeal, tribunal, reference and Supreme Court related issues
16. ADR
17. Tips of winning the income tax cases
18. How to ensure your benefits under the tax laws
19. Any of your queries regarding tax issues.

Therefore, the training session will provide opportunities to learn for those who want to reduce their tax liability and to avoid unnecessary litigations. So one should have transparent idea about the above tax related issues.

Our resource persons are

highly reputed, qualified, well-trained and experienced having sufficient theoretical and practical knowledge in the related areas from home and abroad.

For registration please visit our website: www.traccbd.com, www.banglakothabd.com

Or please contact with-

Ratan No. 01911099921
Sujon No. 01678 060 495
Torab No. 01751593619

Registration fee for One day Course of per participant Tk.3,000/=
VAT @ 15 % will be added to our fees.
Registration fee for Ten days Courses of per participant Tk.13,000/=
VAT @ 15 % will be added to our fees.

We would appreciate if you would kindly nominate official(s) of your esteemed organization for the Training Courses or if you kindly allow us to give you services in your office premises.

Return submission services

We have a long experienced and highly efficient Tax and VAT consultants to give you the following services:

1. Preparation and Submission of
Company Income Tax Return and all other related services
2. Preparation and Submission of Individual Income Tax Return and all other related services
3. Preparation and Submission of Firm's Income Tax Return and all other related services
4. Preparation and Submission of Withholding Tax Return and all other related services
5. Preparation and Submission of VAT returns and all other related services.
6. Any other services relating to Income Tax, VAT, Customs and Legal Issues.

The fees of above services are subject to mutual discussion.

Research

We have some valuable publications like:

1. Income Tax Law of Bangladesh by Md. Jehad Uddin
2. Income Tax Ordinance, 1984
3. Income Tax Rules, 1984
৪. প্রত্যক্ষ কর আইন পরিচিতি, মোঃ জেহাদ উদ্দিন
৫. ইতিহাসের গল্প (খণ্ড ১, ২, ৩ ও ৪), মোঃ জেহাদ উদ্দিন
৬. পলাশী ট্র্যাজেডির ইতিবৃত্ত, মোঃ জেহাদ উদ্দিন
৭. নিখিলের চির সুন্দর, মোঃ জেহাদ উদ্দিন
৮. নজরুল: সাম্যে প্রেমে দ্রোহে, মোঃ জেহাদ উদ্দিন
৯. হে বিশ্বাসীরা, মোঃ জেহাদ উদ্দিন ও নাঈমুল ইসলাম
১০. হে মানবজাতি, মোঃ জেহাদ উদ্দিন ও নাঈমুল ইসলাম।

For further information, please contact Sujon No. 01678 060 495
Training Research And Consultancy Center (TRACC)
68/4, Green Road (2nd floor) Dhaka.

বই পড়ুন

নন্দিত লেখক নজরুল গবেষক মোঃ জেহাদ উদ্দিন এর লেখা বইসমূহ এখন আপনি ঘরে বসেই পেতে পারেন।

বই কিনুন ॥ বই পড়ুন ॥ বই উপহার দিন ॥

ফোন করুন: ০১৬৭৮০৬০৪৯৫

মাহে রমযান শুধু কুরআন নাযিলের কারণেই নিঃসন্দেহে এত বিখ্যাত কিন্তু এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ মাস কুরআন বিজয়েরও মাস হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয়। এ মাসের ১৭ তারিখে বদরের প্রান্তরে স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর নেতৃত্বে মাত্র ৩১৩ জন জীর্ণ শীর্ণ সাহাবী তৎকালীন আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ১০০০ জনের কাফের বাহিনীকে পরাজিত করে ইসলামের প্রাথমিক বিজয়ের সূচনা করেন যা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিজয়ের পথকে সুপ্রসন্ন করে। এ যুদ্ধে কাফের বাহিনীর পরাজয় ইসলামকে জীবনী শক্তি লাভের সুসংবাদ এবং জাহেলী ব্যবস্থাকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত বা মেসেজ শুনিয়ে দিয়েছে। কাজেই এ মাস যেমন কুরআন নাযিলের মাস ঠিক তেমনি নিঃসন্দেহে কুরআন বিজয়েরও মাস হিসেবে সম্মানিত ও সমাদৃত। ইসলাম ও কুফরী শক্তির মধ্যে যত যুদ্ধ রাসুলের জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিল, তার মধ্যে এটাই প্রথম যুদ্ধ ছিল। আর যুদ্ধটা ছিল সম্পূর্ণ একটা অসম যুদ্ধ। জীর্ণ শীর্ণ ৩১৩ নিরস্ত্র সৈন্যের মুসলিম বাহিনী সুসজ্জিত ১০০০ সৈন্যের কাফের বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার দৃশ্যমান কোন যৌক্তিকতা বা সামর্থ্য ছিল না। সেজন্য আল্লাহর রাসুল পর্যন্ত দিধান্বিত ছিলেন। আর তাই তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট দোয়া করার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে, কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি দোয়া করতে থাকলেন। দোয়া করার জন্য তিনি দু'হাত এমনভাবে উত্তোলন করলেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পরবর্তীতে এভাবে সাক্ষ্য দিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তিনি মহান আল্লাহতায়ালাকে ধরে ফেলবেন, তাঁর বগল মোবারক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, দু'হাত তুলে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! এই যে কোরাইশরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! তোমার সেই সাহায্য এখনই এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি করেছিলে আমার সাথে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় ইসলামের দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার নাম নেয়া কিংবা ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না।"

এ যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মুহাজিরদের অর্থাৎ সাহাবীদের পরীক্ষা ছিল এমন কঠিন যে, কারোর কারোর বাপ ছেলে, চাচা মামা, ভাই দাড়িয়েছিল তার প্রতিপক্ষ হিসাবে। এ যুদ্ধে নিজের কলিজার টুকরার উপর তরবারী চালাতে হচ্ছিল তাদের। আল্লাহ রাসুল (সাঃ) এর সেই আবেগময় দোয়া কবুল করে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেছিলেন- মহান আল্লাহ তা'আলা।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে কুরআনকে এত মর্যাদা, এত সম্মান আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং দিয়েছিলেন, যে কুরআন আজ আমাদের নিকট কোন অবস্থায় আছে তা খতিয়ে দেখা দরকার। লক্ষ্য করলে দেখব কুরআন আজ আমাদের সমাজে কত নাজুক অবস্থায় আছে। আমরা পবিত্র কুরআন খতমের পর খতম করছি, আর চুমু খেয়ে সে কুরআনকে পেকেট করে তাকে তুলে রাখছি। কুরআন আজ জ্বীন-ভুত তাড়াবার কাজে, তাবিজ-কবজ দেয়ার কাজে, ঝাড় ফুঁক কিংবা পানি পড়া দোয়ার কাজে, স্ত্রী তালাকের কাজে এমনকি ভিক্ষা বৃত্তির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কুরআনের অনুসারীদেরকে জঙ্গী আখ্যায়িত করে তাদের নির্মূল করার অভিযান চলছে। অথচ কুরআন নাযিল হয়েছিল ব্যক্তিগত, আমাদের সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক তথা যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য। কুরআনের আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য। কুরআন ষ্টাডি করে আমাদের যাবতীয় সমস্যা সমূহ সমাধান করার কথা ছিল অর্থাৎ যে কুরআন ছিল আমাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের একটা উত্তম প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র, সেখানে আমরা কুরআনকে বার বার খতম করার মাধ্যমে মনে হয় যেন ডাক্তারের দেয়া সেই প্রেসক্রিপশন বার বার তোতা পাখির মত পাঠ করছি কিন্তু প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যে ঔষধ সেবনের কথা ছিল তা করছি না। ফলে রুগীর যেমন রোগ পরিত্রানের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না, তেমনি কোরআনের আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের সমস্যাবলীরও কোন সমাধান হচ্ছে না। যার ফলে আজ সমাজে গুম, খুন, রাহাজানি, মারামারি, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, অশ্লীলতা বেহায়াপনা, জুলুম, নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ও ধর্ষণের মত জঘন্য পাপ কাজের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন, "যে কোরআনের বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করে না, সে জালেম, ফাসেক ও কাফের"। কুরআনের আইন মানার কারণে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ স্বর্ণ যুগে পরিণত হয়েছিল। কুরআনকে মর্যাদা দেয়ার কারণেই হযরত হোসাইন (রাঃ) ইয়াজিদের খেলাফত মেনে নিতে পারেন। ঠিক তেমনিভাবে কুরআনকে মর্যাদা দেয়ার কারণেই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর জনাবে মুহাম্মদ (সাঃ) আবু জেহেল, আবু লাহাবকে মেনে নিতে পারেন নাই। এমনকি নিজের জন্মভূমি, মাতৃভূমি ও আত্মীয়স্বজনের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমরা জানি, এক অক্ষর কুরআন পাঠে দশ নেকী। কিন্তু আমার প্রশ্ন আমরা যদি সকাল বেলা "ওয়া আহালাল্লাহুল বাইয়া ওয়া-হাররামার রিবা"- অর্থাৎ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে এবং সুদকে করা হয়েছে হারাম। সকালে এ আয়াত পাঠ করে যদি দুপুর বেলা কোন সুদী ব্যাংকে একাউন্ট বা হিসাব খুলতে যাই, তবে এক অক্ষরে কিভাবে দশ নেকী হবে তা আমার বুঝে আসে না। যদি তাই হতো তবে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর রাসুল (সাঃ) কে এত ত্যাগ তিতিক্ষা, জুলুম, নির্যাতনের শিকার হতে হত না। মাতৃভূমি থেকে বহিস্কার হতে হত না কিংবা হিজরত করতে হতো না। তিনি শুধু বার বার নিজে কুরআন খতম করতেন, আর সবাইকে তা করতে তালিম দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নাই।

তাই আমাদের চিন্তা করা দরকার এবং আত্মসমালোচনা করা দরকার যে, এ মহামূল্যবান কুরআনের সাথে আজ আমরা যে আচরণ করছি, তা দিয়ে কি আল্লাহ তায়ালার নিকট কাল-কিয়ামতে জবাবদিহী করতে পারব বা আল্লাহর পাকড়াও থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব? যদি তা না হয় তবে আসুন আজকের দিনে এ পবিত্র মাহে রমজানের প্রাক্কালেই আমরা আবারও শপথ গ্রহণ করি যে, শুধু কুরআন তেলায়াতেই নয়, চুমু খাওয়া কিংবা জ্বিন-ভুত তাড়াবার কাজেই কুরআনকে ব্যবহার করব না। আমরা কুরআন বুঝে পড়ব এবং কুরআন অনুযায়ী আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়ে তুলব। তবেই রমজান মাস ও কদরের রাত্র আমাদের জন্য রহমত, মাগফেরাত ও নাযাতের কারণ হবে এবং তবেই আমাদের সেহরী খাওয়া, ইফতার করা এবং তারাবী সহ কুরআন খতম করা ও সিয়াম সাধনা করা সফল হবে, সার্থক হবে। অন্যথায় হাদিসে কুদসীর ভাষায় এ সিয়াম সাধনা কোন কাজে আসবে না, সেখানে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ বলেন এমন কিছু রোজাদার আছে, যাদের ভাগ্যে শুধু ক্ষুদা, পিপাসা ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই জুটে না।"

মোঃ মিজানুর রহমান

মোবাইল: ০১৬৭১৮০৯১০৯

প্রতিবেশীর অধিকার Neighborhood rights

এসএমডি বায়জীদ হেলাল

আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি। মানুষকে নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হয়। নানা কারনে সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে থাকি। আমার আশপাশের লোকদেরকেই বলা হয় প্রতিবেশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরীল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এত বেশি তাকিদ করেছেন যে, আমার কাছে মনে হয়ছে প্রতিবেশীকে মিরাছের অংশিদার বানিয়ে দেওয়া হবে। (দ্র.সহীহ বুখারী ৬০১৪;সহীহ মুসলিম ২৫২৪) কিন্তু আজকাল এ বিষয়ে আমাদের মাঝে চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে শহরের মানুষের মাঝে। বছরের পর বছর পার হয় পাশের বাড়ির কারো সাথে কোনো কথা হয় না, খোঁজ খবর নেওয়া হয় না। অথচ প্রতিবেশী বলতে আমরা আমাদের আশে পাশের ৪০ বাড়ি পর্যন্ত সবাই প্রতিবেশী বুঝি এবং মানি। (A Muslim should maintain good relations with his relatives, but he should not unjustly favor them over others. Further, a Muslim must be good to his neighbors, no matter their religion. But the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) taught us that a "neighbor" is not just the one next door but includes all those up to forty houses in all directions - effectively a whole neighborhood) কিন্তু প্রতিবেশীর হক আমরা কয়জনে বা আদায় করার চেষ্টা করি, যেখানে প্রতিবেশীর অধিকার হাক্কুল এবাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, যাত্রাপথে সহযাত্রীও প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। দূরত্বের দিক দিয়ে প্রতিবেশী দু প্রকারঃ ১। নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২। দূরবর্তী প্রতিবেশী। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে প্রতিবেশী তিন প্রকার: ১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী। ২. মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী। ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী।

> “অনেক নফল ইবাদত করা সত্ত্বেও প্রতিবেশীকে কথার দ্বারা কষ্ট দিলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আবার নফল ইবাদত কম করলেও প্রতিবেশীকে কষ্ট না দিলে,উক্ত হাদীসে বেহেশতের সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সজাগ এবং সাবধান হওয়া খুবই জরুরী।”

আর এই প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের রয়েছে অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীসে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

* রাসুল(সা) বলেছেন, ‘তোমরা যখন তরকারি পাকাও তখন তাতে জল দাও এবং ঝোল বাড়াও এবং কিছু অংশ তোমার প্রতিবেশীর কাছে পৌছে দাও’ (তিরমিযী)।

* হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন- আমি রাসুলে পাক সা.-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যাক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেটপুরে খায়, সে মুমিন নয়।” [মিশকাত]

* হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, একজন লোক নবী কারীম সা.-এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহুর রাসুল সা.! অমুক মহিলা বেশি বেশি নফল নামায আদায় করে, নফল রোযা রাখে, দান-খয়রাত করে, এসব বিষয়ে সে বেশ খ্যাত। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিণাম সম্পর্কে বল্লেন,-“সে জাহান্নামী”।

ঐ ব্যক্তি আবারো বলল,“হে রাসূল সা.! অমুক স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে এ কথা বলা হয় যে সে (ফরজ ও ওয়াজিব আমল পুরোপুরি আদায় করে তবে) নফল রোযা কখনো কখনো রাখে, নামায কম আদায় করে এবং পনিরের যৎসামান্য পরিমাণ দান-খয়রাত করে। কিন্তু সে মুখের দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তার কি পরিনাম হবে?”

উত্তরে রাসূল সা. বললেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মিশকাত শরীফ]

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, অনেক নফল ইবাদত করা সত্ত্বেও প্রতিবেশীকে কথার দ্বারা কষ্ট দিলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আবার নফল ইবাদত কম করলেও প্রতিবেশীকে কষ্ট না দিলে,উক্ত হাদীসে বেহেশতের সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সজাগ এবং সাবধান হওয়া খুবই জরুরী। আমাদের ঘরের সবচেয়ে নিকটস্থ প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সবচেয়ে বেশি। কারণ, তারা আমাদের আত্মীয়ের চেয়েও বেশি গুরুত্বপুর্ণ। আমার আপনার বিপদে তারাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে, যা আত্মীয় স্বজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এসব প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের সুদৃষ্টি দেওয়া উচিত। “যে আল্লাহ্ ও বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়”

এস এমডি বায়জীদ হোসাইন হেলাল
এল এল বি অনার্স (বি. ইউ)
গুলবাগিচা, বেড়তলা
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

পাপ
আবু সাকী মাহবুব

আমি যদি হাত রাখি হাতে
দাবানলে পুড়ে যায় আমাজান
যদি দৃষ্টি রাখি ও চোখের গভীরে
চৌচির হয়ে যায় আটলান্টিকের বুক
আমি যদি ভুল করে আমাকে ছুঁয়ে দেই
আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি নামে সূর্য-পিঠে

আমি পালাতে গিয়ে ভুল পথে হাঁটি
আর, সকল ভুল পথ নদীর কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়

কৈশোরের মুখোমুখি দাঁড়ালে যৌবন
যাযাবর গাংচিল ডানা মেলে দেয়
ঝরে পড়া পালকের শুভ্র মায়ায়
জন্ম নেয় আরেকটি নতুন আকাশ
আমি নক্ষত্রের দিকে হাত বাড়ালে
কৃষ্ণবিবর এসে দহন জ্বালে তারার মেলায়

আমি নিষিদ্ধ অন্ধকার ছুঁয়ে ভিজি জোছনার গানে
আমি অরণ্যের গন্ধ মেখে বুকে ঘর বাঁধি বালুকা বেলায় ॥

বরফ-কষ্ট
সমর ইসলাম

কষ্ট জমে জমে বরফ হয়ে গেছে
উত্তাপ ছড়িয়ো না–
বরফ গলে যেতে পারে;
বরফগলা নদীর প্লাবন বড় ভয়ানক
তার তাণ্ডবে ভেসে যেতে পারে
তোমাদের পানকৌড়ি ভালোবাসা
যুগলবন্দী ফ্রেম।
বরফ-পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে পারে
মেঘ হয়ে ঢেকে দিতে পারে
তোমাদের স্বপ্নের আকাশ; কিংবা
ঢেউয়ের তোড়ে মুছে যেতে পারে
প্রগাঢ় চুম্বনের দাগ।
অতএব চুপ থাকো
যেভাবে আছো স্থির, সেভাবেই
কথা বলো না–
মেলে ধরো না ফের স্মৃতির পাতা
তাহলে কষ্টরা বাড়বে আবার
জমতে শুরু করবে নতুন বরফ।

নিস্তেজ আর্তনাদ
আমিনুল ইসলাম তন্ময়

গায়ে-গতরে হৃষ্টপুষ্ট সে
পিরানটা ছিল আঁটোসাটো
এতেই যেন লালা ঝরে
লোলুপ শকুন দলের,
ভয়ে গুটিশুটি মেয়েটি;
কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ–
ভয়ার্ত চোখে ইতিউতি
একটু আশ্রয়।
কাজের নামে; পেট ভাত
মিলেছিল তার ঠাঁই
জোতদার ঘরে চুইয়ে পড়া সুখ
ঝলমলে আনন্দে
বোন পেয়েছিল মেয়েটিকে
গৃহস্থের দুই তনয়
আশ্রয়হীনা অভাগী যেন
পাই সে পাথারে কুল।
চিকন চোখে আঁধার কাটে
সুদি মহাজন বেটে জোতদার–
অস্ফুট স্বরে মাংসাশী নেশা,
নিরুপায় ঝিয়ারী ডানা ঝাপটে নিস্তেজ
শরীরের ভাঁজে ঢেউ তোলে আর্তনাদ;
মেঘ শূন্যতায় মথিত আকাশ
ঝিঝি পোকার ডাকে চেতনা ফেরা,
লজ্জার ফসল ঘৃণ্য ঘৃণায়
বাড়বে এবার জোতদার ঘরে।

পথের শেষ নেই তবু পথে
মোঃ মোসলেম উদ্দিন সাগর

তুমি তৃষ্ণায় ছটফট করছো?
গঙ্গা যমুনার পানি খেয়ে ফেলতে চাও!
আমার দুই গঙ্গা যমুনাতে চৈত্রের খরা,
তুমি রক্ত গঙ্গায় স্নান করতে পারো।
আমার শিরধারায় বিপ্লবের ঢেউ,
বৃষ্টি ঐ পাড়ে-
তুমি সেথায় চলে যাও শান্তির পবনে।
আমি শোষিতের মিছিলে ঘাম ঝরিয়ে ক্লান্ত
পুড়ছি অন্তর দহনে।

মোঃ জেহাদ উদ্দিন-এর চারটি কবিতা

ফররুখ আহমদ এর জন্মশতবর্ষে

তোমার শব্দ ঝংকারে পুনঃ কেঁপে উঠেছিল সাত সাগরের জল
তোমার এলহানে সেই সম্বিৎহারা মাঝি পেয়েছিল নবীন বল।
তসবির সম ছবি হয়ে যারা প্রহর গুনছিল মৃত্যুর
তাদেরি তুমি দেখিয়েছিলে হেরার দুয়ার কতদূর।
তোমার কাব্যে নতুন করে এসেছিল সেই সিন্দাবাদ
হাজার বছর ঘুমায়ে যে কিনা সব করেছিল বরবাদ।
জোয়ারের ফেনা মওজের ঢেউ নারঙ্গী বনের দোল
নাড়া দিয়েছিল সেই মাঝিকে যার ছিল শত ভুল।
ঘোর অমানিশায় তুমি এনেছিলে লক্ষ কোটি তারা
তোমার কাব্যে পেয়েছিলাম সেই সিরাজামমুনিরা।
রাতের আঁধার ভেদ করে তুমি বাজিয়েছ রণভেরী
তুমি শুধায়েছ, রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
তুমি চেয়েছিলে মুছে দিতে কাল জুলমাত আর অতীত গ্লানি সব
শুষ্ক মরুতে আবে হায়াতের চেয়েছিলে ফুল পাখিদের কলরব।
তোমার কাব্যে মজলুমেরা আশায় বাধে যে বুক
তুমি গণমানুষের কবি তুমি আমাদের ফররুখ।
তোমায় স্মরিতে জন্মশতবর্ষে হয় তো বাজেনি বীণ
তা বলে তুমি দুঃখ করো না, জনমনে তুমি থাকবে চিরদিন।
আর নিঃস্ব জাতি কেমনে শোধিবে তোমার অপার ঋণ।
তারচে' ভাল, তুমি দোয়া কর, যেন আমরা মানুষ হই
আবার যেন সেই জাহাজ ভাসে কাঁপায়ে সাগর অথৈ।
(১০ জুন ২০১৮, কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর)

মেঘনা

মেঘনা কেবল নয় তো নদী
সম্মোহনী নাম
মেঘনা আমার সঞ্জীবনী
শক্তি সুধা ধাম।
পাহাড় থেকে জন্ম নিয়ে
ছুটে সাগরপানে
ধন্য করে সবাইকে সে
মিষ্টি জলদানে।
দুকূলে তার গড়ে ওঠে
বসতবাড়ি কত
কিংবা বণিক কেন্দ্র গড়ে
যায় যে শত শত।
কখনো বা একূল ভেঙে
গড়ে অপর কূল
তবুও তাহার অবদানের
নাই যে কোন তুল।
মেঘনা আমার শিশু বেলা
কিশোরবেলার খরস্রোতা নদী
দাঁড়াই আমি তাহার পাশে
তাহার কোন দুঃখ আসে যদি।
(মেঘনার বুকে, ১৭ জুন ২০১৮)

ম্যানিলা

এই বৃষ্টি এই নাই
আছি আমি ম্যানিলায়
সূর্য কোথায় লুকিয়ে যায়
হঠাৎ করে, বুঝা দায়।
সবার হাতে ছাতা তাই
আছি আমি ম্যানিলায়।
বৃষ্টি এত পেয়ে তবু মুখটা মলিন করে না
কারণ হেথায় বৃষ্টি জলে পথে পানি জমে না।

ককটেল পার্টি!

(১৯ রমজান, ১৪৩৯ হিজরি, এডিবি সদর দপ্তর, ম্যানিলায় চলছিল ককটেল পার্টি। এর মধ্যেই ইফতারের ব্যবস্থা করে নিলাম)

ককটেল পার্টি!
কারো কাছে অতি মজা
কারো কাছে ডার্টি।
এরি মাঝে যদি হয়
করিতে ইফতার,
যদি দেখি চারিপাশে
ককটেল পার্টনার;
কি বা তাতে যায় আসে
মিলেমিশে একাকার,
করে যাব এরি মাঝে
কর্ম যার যার।
ইসলাম তারে বলে
ঘৃণা কভু নয় দীন
এরি মাঝে গেয়ে যাব
পাক কুরআনের বীণ।
আমার যে ধর্ম
আমি অনুসারী যার
দেশে দেশে আমি তার
বড় এম্বাসেডার।

মা, আমার মা

অভ্র ওয়াসিম

মা, আমার মা
পৃথিবীর বুকে একটুকরো বেহেশত
পরম শীতল বায়ু স্ফটিক ঝর্ণাধারা
চোখ জুড়ানো তুলনাহীন হৃদয় ভরা সুন্দর
মনের কষ্ট আমার আগেই বুঝতে পারে সে
কেমনে তারে উপমা দিয়ে বুঝাই ।
খুঁজে দিতে পারবে তুমি তামাম পৃথিবী জুড়ে
দেখো, এই মা-টা না বড়ই যে কুৎসিত
মিলবে নারে বোন মিলবে না ভাই–
তুই তো বড়ই হতভাগা দুই দুনিয়ার 'পরে
মাকে ভুলে তালাশ করিস সুখের খানাপিনা
হায়রে পাপী সব হারিয়ে ফিরবি পথে পথে
মায়ের পদতলে জান্নাত বয়ে যায়
অন্ধ তুই হেলায় হারিয়ে জাহান্নামে মজলি!
মহানবী বিছিয়ে দিয়েছিল গায়ের চাদরখানি
দুধ মা হালিমার বসার তরে ।
তুই দেখিসনি সেদিন মহানবীর আফসোস
গায়ের ছাল বিছিয়ে দিলেও
মায়ের দুধের ঋণ শোধ হবে নারে ।
মা আমার মা জননী
তুমিই আমার প্রাণ, তুমিই আমার বেহেশত
তোমার ছায়ায় জগৎ হাসে নিত্য খুশির দিনে ।
২৮.০৫.১৮, বিকেল ৪:৫৫
ঢাকা ।

পবিত্র রমজান

নাঈম দূর্জয়

রমজানে ওই ৩০ রোজা,
মোদের উপর নয়তো বোঝা,,
জান্নাতের পথ করবে সোজা...
সারাদিনের উপবাস,
নয়তো কোনো উপহাস,,
শেখায় মোদের ধৈর্য্য আর সংযমের সাথে করতে বসবাস...
পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, আরও সাথে তারাবী,,,
সহজ করে পেতে মোদের, জান্নাতের চাবি...
রমজানের ওই রোজার শেষে, আসবে খুশির ঈদ,,,
শেখাবে মোদের এক হতে সবাই, গড়তে ভালোবাসার ভীত...

রমজানুল কারীম

নাঈম দূর্জয়

আহলান সাহলান,,,,
হে মাহে রমাদান....
তুমি খোদার পক্ষ হতে,,
মোদের জন্য উত্তম দান...
এলে রহমতেরই বাণী নিয়ে,,
দিলে নাজাতেরই দরজা খুলে,,,,,,
অবুঝ জাতি তবুও যাই,,,
তোমার গুণগান ভুলে...
তোমার রহমতের ছায়ায় মোদের রেখো ঘিরে,,,
যাবো না কভু তোমার বাঁধন ছিড়ে...
ক্ষমা করো মোদের এই রমজানে,,,,
করেছি যত পাপ অবুঝ জ্ঞানে...
দাও তৌফিক দাও,সফলকামের,,,,
ছড়াতে চাই দ্যুতি তোমার নামের...

ফিলিস্তিনের বন্দি

মোহাম্মদ এনাম সিকদার

(একদিন যাযাবর ইয়াহুদিদের দয়া করে ফিলিস্তিনি মুসলমানগণ তাদের জমিনে মাথাগুজার ঠাঁই দিয়েছিল। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ইয়াহুদি সম্প্রদায় আজ তার প্রতিদান হিসেবে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর বর্বর নিপীড়ন-নির্যাতন চালাচ্ছে। ওরা ইজরাইল নামের একটি রাষ্ট্র গঠন করে রাষ্ট্রটির সীমানা বৃদ্ধি করতে বহু ফিলিস্তিনি মুসলমানকে হত্যা-বন্দি এবং দেশান্তর করে দিনে দিনে ফিলিস্তিন দখল করে চলছে। আজ দখলদার ইসরাইলের কারাগারে বন্দি অজ্ঞাত সংখ্যক ফিলিস্তিণী মাজলুম মুসলমান। তাদের উপর চলছে বর্বর নিপীড়ন-নির্যাতন। একদিন কিছু বন্দি একত্রিত হলো, তাদের মাঝে চলিল
কথোপকথন..........)

প্রথম বন্দি-
শোনো তোমরা বন্দি ভাইয়েরা, কাহিনী আমার বেদনাময়,
সাত সাল কেটেছে বন্দিশিবিরে দুঃখ ভরা মোর হৃদয়।
প্রতিটি প্রহর কাটে কারায় বয়ে একাকীত্বের বোঝা ভার,
তার উপর শত জুলুম নিপীড়ন তনু মনে হয়েছে ঢের সওয়ার।
নিঃসঙ্গ একা কাটে দিন বুকে জমা বিপুল ব্যথা,
নাচার আমি বলিতে পারিনি, মনে প্রকাশের কী যে ব্যাকুলতা।

বন্দিগণ সমস্বরে -
বল বন্ধু বল তুমি বেদনাময় সে কাহিনী তোমার
কি করে তুমি হয়েছো বন্দি? কোন সে কারণে হাহাকার?

বন্দি-
এই বুকে মোর লুকিয়ে আছে হাজার গোপন ব্যথা
আজ তোমাদের পেয়ে বলছি শোনো তারি ঈষৎ কথা।
সর্বহারা এক মানুষ আমি
পশ্চিম তীরে ছিল বসত আমার।
সাত সাল পেরুলো বন্দি শিবিরে
আজ হায় আমি বে-কারার।
সেই দিনগুলি মোর বড় মনে পড়ে যখন প্রিয়জনদের ভীড়ে
পরম সুখে কেটেছে দিন আমার জন্মভূমি পশ্চিম তীরে।
খোদার নেয়ামাত ছিল পূর্ন, ছিল না ঈষৎ কমি,
পূর্ণতায় যার জীবন ভরা তার কি থাকে গমি?
গৃহের ধারে মোর আঙুর বাগান, কত সহসায় খসে পড়ে।
দূর দিগন্তের পাখিরা আসিত সাঝ সকালে উড়ে।
দেখিতাম চাহি অপলক আমি বাতায়ন খুলে বসি
মধুর মূর্ছনায় মেতে উঠিত গাছের শাখে আসি।
লতাপাতা আর ফুলে ফলে ভরা ছিল ঢের সেথা
মনোহরী এমন দৃশ্য দেখিলে জুড়াইতো মনের ব্যথা।
সাতসাল পেরিয়ে আজিকে মোর যতটুকু পড়ে মনে, আমারি মতো ছিল গো সুখী পড়শী সর্বজনে।
হায়! তারপর একদিন গুমোট সন্ধ্যা বেলা,
ঘরের আঙিনায় করিতেছিলাম অবুঝ মেয়েকে নিয়ে খেলা।
বন্দি বলিতে চাহিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল)

বন্দিগণ সমস্বরে - তারপর...তারপর...

বন্দি-
তারপর! তারপর আমি হঠাৎ শুনি আওয়াজ-
ভীষন ভয়ংকর
মুহুর্মুহু এমন দ্রীম দ্রীম শব্দে কেঁপে উঠেছে অন্তর। সেদিন ইসরালি সেনা

ছুড়েছে বোমা বিপুল বেশুমার
আহারে এক পলকে উড়ে গেলো প্রিয় সন্তান আমার। ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি তখন
আমি বেহুশ হলাম এসব দেখিয়া নয়ন মেলি।
তারপর আমি ক্ষাণিক পরে যখন সংঙ্গা পেলাম ফিরে জ্বলছে দেখি আগুনের শিখা মানুষের ঘরে ঘরে।
দিশেহারা হয়ে তখন আমি দিগ্বিদিকে তাকাই,
কোনো পথ প্রান্তর দেখিনি যেখানে মানুষের অস্তি মজ্জা নাই।
রক্তে রাঙা পথ প্রান্তর দেখি আমি আর-
তাসবির মতো নগরী আমার একি হল দশা তার!
তারপর দেখি কারবালার মাতম শুরু হয়েছে নগরী জুড়ে,
সাত আসমান কেঁপে কেঁপে উঠে মাজলুমানের আর্তস্বরে।
শবের মিছিল নিয়ে প্রতিমুহূর্তে স্বজন ভাসে নয়ন জলে,
আহারে, কত আপনজনের সমাধি করেছি পাষাণ
হাতে মাটির তলে।
সেদিন এ রক্ত রাঙা হাতে খুরেছি বিপুল গোর,
বিদায় দিয়েছি ভাঙা বুক্লোন করে অশ্রুর।
(বন্দি চোঁখের অশ্রু মুছিতে লাগিলো)
বন্দিগণ সমস্বরে - তারপর....তারপর...?
তারপর দেখি যখন আমারি মতো সবাই করে আহাজারী হারায়ে বুকের জান, এসব দেখে বল কেমনে সহে মোর ব্যাথিত প্রাণ?
তখন বিদ্রোহেরি রাহে চলি হাতে নিলাম হাতিয়ার,
সাত দিন সাত রাত্রি পর আমি হয়েছি গ্রেফতার। শুরু হয়েছে সেই হতে মোর বন্দিশিবিরে জীবন দিওয়ানার হালে বন্দি ভাইয়েরা কাটে আমার প্রতিক্ষণ।
শুনেছো ভাই শুনেছো তোমরা কত ব্যথা মোর মনে ?
বেদনার বাণ বহে হৃদয়ে অশ্রু কি বাধা মানে?
বন্দিগণ সমস্বরে -
বেদনাময় কাহিনী তোমার মোদের হয়েছে জানা,
আছো তুমি বন্দিশিবিরে বন্ধু দুখি মনা।
বুকে তোমার বিপুল ব্যথা আছো দিওনার হালে,
শুনে তোমারি মতো জ্বলছে হৃদয় ব্যথার তীব্র অনলে।
২য় বন্দি- (নারী)
আমি প্রার্থনা করি দিনরাত্রি পাক আল্লার দরবারে,
উঠিয়ে যেনো নেয় তিনি মাজলুম এই বান্দিরে।
জালিমের এই বন্দিশিবিরে বড় নিপিড়ীত আমি,
বাঁচিবার সাধ মুছে গেছে আজ তাই গো মৃত্যুকামী।
বন্দিগণ সমস্বরে -
কি হয়েছে বোন আমার ? কেনইবা আজ মৃত্যু কামনা তোমার?
বল, মোদের বল্লে কোন সে কারন এমন প্রার্থনার ?
বন্দি-
বড় নিদারুণ কাহীনি আমার প্রকাশের পাই না ভাষা
লোহার কঠিন গরাদের ভেতর হারায়েছি আজ দিশা।
ঝড়ের দিনের পাখির মতো দিশেহারা আজ আমি
স্বস্তি নাই, শান্তি নাই জীবন রবি অস্তগামী।
দিবানিশি এই কারাগারে চালায় ওরা পাশবিকতা
লোহার কপাটে শিলার প্রাচিরে রয়েছে আমার শোকগাথা।
বড় ব্যাথা মোর হৃদয়ে মাঝে তাই করি আহাজারি
কাঁদিতে কাঁদিতে ফুরিয়েছে ভাই দুই নয়নের বারি।
আজ মনের ব্যথা প্রকাশের লাগি পেলাম তোমাদের ভাইয়েরা শোনো;
বলি দিন রাত্রি দিওয়ানার হালে কাটে আমার প্রহর কেনো।
হয়তো শুনেছো বন্দি ভাইয়েরা নবী সালেহ গায়ের নাম?
রামাল্লার অদূরে চলে সেথা বর্বরতা সুভে-শাম।
সেথাই আমি করিতাম বসত,সাথে সন্তান পিতৃহারা,
দিনরাত ইয়াহুদ সেনার অত্যাচারে ঝরতো অশ্রু ধারা।
জবরদখল রোজ করিতেছে ওরা মোদের আপন ভূমি,
তাই একদিন নাচার হয়ে প্রতিবাদ করি আমি।
রাজপথে আমি দিয়েছি স্লোগান দেশের ঝান্ডা হাতে
জোর জুলুমের করেছি নিন্দা সেদিন সবার সাথে।
তারপরদিন আমার ঘরে পড়লো তাদের হানা
তখন আমারে বন্দি করিল হিংস্র ইয়াহুদ সেনা।
তিন চার জন সেনা এসে যখন আমায় টেনে তুলিলো গাড়ি তখন আমার অবুঝ শিশুরা করেছে বিপুল আহাজারি।
আহারে মা মা বলে ছুটেছে বহুদূর গাড়ির পিছু পিছ
হায় বর্বর ইয়াহুদের বুকে মানবতা জাগেনি কিছু।
বন্দিগণ সমস্বরে -
তারপর...তারপর.....
বন্দি-
সেই হতে আমি এই বিমর্ষ যিন্দানে কেটেছে দুই সাল
কি করে বলি মোরে হিংস্রের দল করেছে কি হাল!
আমার সতীর্থ কেড়ে নিতে চাহে হায়েনারা দিন রাত
দেখো তোমরা বন্দি ভাইয়েরা সারা দেহে শত আঘাত।
হায় বর্ণিতে কি পারি মুখে সকল কাহিনী আমি ওরা হিংস্র হায়েনা ওরা নিহঙ্গ জাহান্নামি।
আজ পিশাচেরা আমায় রেখেছে বন্দি বিমর্ষ কারাগারে,
মোর পিতামাতা হারা সন্তানদের কথা বারবার মনে পড়ে।
জানি না আজি মোর এতিম শিশুরা রয়েছে কোন হালে, আহারে পিতা হারালো কঁচি বয়সে, জননী তাদের জেলে।
কেঁদে কেঁদে হায় তাদের জানি ফুরিয়েছে নয়ন জল, হয়তো করিতেছে গড়াগড়ি করে মর্সিয়া অনর্গল।
আমার তরে রোজ রোজ জানি পথ চেয়ে রয়েছে হায়!
মা, মা বলে ডাকিতেছে ওরা সকাল-সন্ধায়। দিওনার মতো ফিরিতেছে হয়তো আমার অন্বেষণে
প্রহর গুনছে রোজ পথে প্রান্তরে আশা বাধিয়া প্রাণে।
ভাই, দিনে দিনে আজ বছর গেলো সন্তানহারা ব্যথা বুকে
আহারে আইডাই করি দিবসনিশি তাদের হারানো শোকে।
মোর জাদুদের দেখি রোজ রাতে যখনি নিদ্রা যাই
হায় ঘুম ভেঙে দেখি আমি একা তারা পাশে নাই!
এমনি করে কাটে প্রতি রাত বন্দি শিবিরে আমার তখন আরো শোকার্ত হৃদয়ে বেড়ে যায় হাহাকার।
জানিনা মুক্তি পাবো কি না, হবে কি না আর দেখা,
ভাবি মনে মনে এই বুঝি হায় আমার ললাট লিখা!
বন্দিগণ সমস্বরে -
জেনেছি তোমার নিপিড়ীত হৃদয় পুড়ছে বিপুল শোকে,
কাহিনী শুনিয়া মনের অজান্তে জল এলো দুই চোঁখে।
সবর করো প্রিয় বোন,
করিয়ো না আহাজারী, মহান খোদার আছে জানা তুমি পবিত্র নারী।
তোমার এই দূর্দশা তিনি দিখিতেছে নিশ্চয়,
সুমাইয়ার মতো হবে তোমার আখেরে বিজয়।
(চলবে)

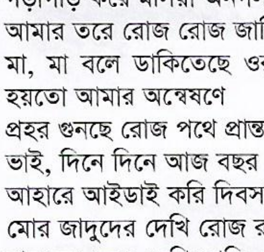

মোহাম্মাদ এনাম শিকদার
প্রবাসী বাংলাদেশী, দোহা, কাতার।

মহাসাগরের এক বিন্দু কণা নয়

রাজিন শারাফি

তুরস্কের বুকাতে রুমির ভাস্কর্য

মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি (বলখি) রহ. বলখে ৩০ সে সেপ্টেম্বর ১২০৭ সালে জন্মগ্রহন করেন। বলখে জন্মগ্রহন করায় তাঁর নাম হয় বলখি। তিনি ইরান কেন গোটা বিশ্বে একজন বড় দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর ফারসি কবিতা বিশ্ববিখ্যাত শামসে তাবরিজের সংপ্রর্শে

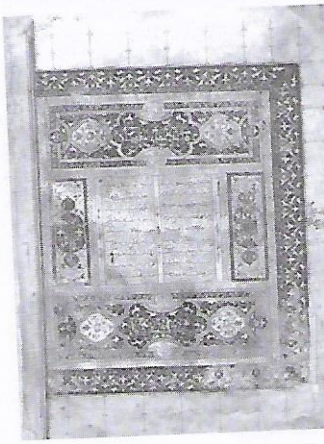

উভয় পৃষ্ঠা অঙ্কিত প্রচ্ছদ প্রথম বই কবিতা সংকলন "মসনবী" ১৪৬১ পাণ্ডুলিপি

জালাল উদ্দিন রুমি সূফী অধ্যাত্মবাদীদের সাথে জড় হয়েছে

এসে তিনি সুফিবাদ সম্পর্কে জ্ঞানর্জন করেন। এবং এর অন্যতম ফলাফল হলো 'মসনবি' তাঁর অন্যতম বাণী ছিল আমরা মহাসমুদ্রর কোন ক্ষুদ্র কণা নয়, বরং একটি কণার ভিতর গোটা মহাসাগর আমরা সাধারণত বিভিন্ন কারণে নিজেকে তাছিল্য করে এমন বলে থাকি, আমরা মহাসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র কণা মাত্র। কিন্তু বস্তুত তা সম্পূর্ণ ভূল। এর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা হলো আল-কুরআন। যেখানে আল্লাহ আমাদের বলেছেন আশরাফুল মাখলুকাদ বা সৃষ্টির সেরাজীব আর একটু গভীরে গেলে দেখা যায় যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মূলত চোখের ধাধা। যেমন : রঙা বস্তুত রঙ বলে কিছু নেই। পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী রঙ কেবল মানুষের মনেই বিরাজ করে। বস্তুর আলো প্রতিফলনের ধরনের ভিত্তিতে রঙ কে আমাদের চোখে বিভিন্ন ধরণের দেখায়। যদি কোনো বস্তু অধিক আলো শোষণ করে তবে তাঁর রঙ আমাদের চোখে দেখায় কালো।

আবার রয়েছে বিভিন্ন ধরনের এবাদাত খানা। কোনোটি অন্যটির চেয়ে অধিক সমৃদ্ধ এবং বিখ্যাত বস্তুত ইবাদাত খানার উপর মানুষের ইবাদত নির্বর করে। সবকিছুই মানুষের এ হৃদয় জন্য। ঘরে ঘরে ইবাদত করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অনুভূতি লাভ করা যায় যদি ইবাদখানার উপর নির্ভর করে মানুষের আত্মার শুদ্ধতা এবং তার হৃদয়ের অবলার উপর নির্ভর করত না। তবে হযরত উমর (রা) কে মসজিতে নববিতে নামাযরত মানুষ গুলো হত্যার চেষ্টা চালাত না। যদি তাই হতো তবে সে গুপ্তঘাতক প্রচেষ্টা চালাত না। এর এক মাত্র কারণ তার আত্মশুদ্ধতা ছিল না। তার আত্মা ছিল লোভী, অমানবিক সুতারাং এ হৃদয়ই হলো সবচেয়ে বড় ইবাদত খানা এ হৃদয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় আদালত গোটা বিশ্ব এ ক্ষদ্র হৃদয়ের ভিতরেই রয়েছে গোটা মহাবিশ্ব। এ হৃদয়ে জাগ্রত প্রেম দিয়েই জয়করা যার খোদাকে, "নজরুল বলেছেন ওগো বিজয়ী নিখিল হৃদয় করো করো জয় মোহন মায়ায়" ভালোবাসা ছাড়া কিছুই অজিত হয় না। আমরা মনে করি খোদা কতই না দূরে কিভাবে তার দিদার পাওয়া যায়? এ সম্পকে নজরুলের উক্তি, "কি হবে তোর কাবার খোজে আমায় খোঁজ তোর হৃদয় ছায়ায়" আর্থৎ নিজের হৃদয়ের খোদাকে না খোজলে আল্লাহকে কাবা ঘরে পাওয়া যাবে না। এ ধারনা আবিষ্কার কারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মনস্বর হাল্লাজ এজন্য তিনি বলেন 'আনাল হক্ব' যাকে আমরা শিরক বলে ভূল করে থাকি। আসলে এখানে তিনি বলেছেন যে আল্লাকে আমি তোমার আত্মার শুদ্ধির মাধ্যমে পেয়েছি। মূলত এ ধারনাই হলো সুফিবাদ। উপযুক্ত বিশ্লেষণে এই দৃষ্টি গোচর হয় যে, ভালোবাসার মধ্যই লুকায়িত রয়েছে গোটা মহাবিশ্ব এজন্য রুমি (রহ.) বলেন "আমরা একটি বিন্দুর মধ্যে গোটা মহাসাগর আবার আমাদের জ্ঞানের সীমা বাস্তবতার দিক থেকে মহাসমুদ্রর একটি কনা তাও ভূল হয়। খোদা তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্য আমরা সর্বপ্রথম আমাদের হৃদয় বা আত্মাকে শুদ্ধ করব কারণ এ আত্মা বা হৃদয়ের ভিতর নিহীত রয়েছে মাটি মহাবিন্দু।

রুমির কবিতা খচিত প্রতিবিম্ব পেয়ালা
১৩ শতকের প্রথম দিকে ব্রুকলিন মিউজিয়াম

Frutika
/purefrutika
একটু বেশিই পিওর!
প্রিজারভেটিভমুক্ত
পিওরিটির গ্যারান্টি
Frutika
Mango Fruit Drink
Little
Frutika
Mango Fruit Drink
Frutika
Mango Fruit Drink
Frutika
Mango Fruit Drink

Reg. No. DA. Dhaka 6102 • The Monthly Banglakotha Vol-8Issu-1 • April-June 2018 • TK. 50.00